Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সীরাহ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাতিমা ফারহীন চৌধুরী

রোলঃ ২১৬০২০২৮৭

১৮ জুন,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সীরাহ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাতিমা ফারহীন চৌধুরী

রোলঃ ২১৬০২০২৮৭

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "সীরাহ" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফাতিমা ফারহীন চৌধুরী, আইডিঃ 216020287 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সীরাহ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

১৮ জুন, ২০২৪ ইং

ফাতিমা ফারহীন চৌধুরী

আইডিঃ 216020287

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা

بسم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

হে আল্লাহ! আপনি (আপনার নিকটস্থ উচ্চসভায়) মুহাম্মাদকে সম্মানের সাথে স্মরণ করুন এবং তাঁর পরিবার-পরিজনকে, যেমন আপনি সম্মানের সাথে স্মরণ করেছেন ইবরাহীমকে ও তাঁর পরিবার-পরিজনদেরকে। নিশ্চয় আপনি অত্যন্ত প্রশংসিত ও মহামহিমান্বিত। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবার পরিজনের উপর বরকত নাযিল করুন যেমন আপনি বরকত নাযিল করেছিলেন ইবরাহীম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর। নিশ্চয় আপনি অত্যন্ত প্রশংসিত ও মহামহিমান্বিত।

الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ اللَّهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَه ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

আল্লাহ রব্বুল আল আমিন রসুলুল্লাহকে পৃথীবিতে প্রেরন করেছেন যাতে তিনি সকল মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসেন। আল্লাহ তায়ালা সর্বশেষ রিসালাত এর মাধ্যমে রসুল কে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন সকল উম্মাহ এর জন্য এক অনন্য পুরস্কার হিসেবে। তিনি মানুষকে দেখিয়েছেন সেই পথ যে পথ সহজ সরল পথ, যে পথ আমাদের রব এর নির্দেশিত পথ, যে পথকে বলা হয় সীরাতুল মুস্তাকিম এর পথ।

আল্লাহ বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَنَذِيرًا

এবং আমি আপনাকে সমস্ত মানুষের জন্য একজন সুসংবাদদাতা ও সতর্ক কারী রূপ এ পাঠিয়েছি।

সুরা সাবা আয়াত নং ২৮।

তিনি আমাদেরকে মানুষের দাসত্ব থেকে এক আল্লাহর দাসত্ব এর দিকে নিয়ে যাওয়ার রাস্তা দেখিয়েছেন। এক আল্লাহ তায়ালা এর দাসত্ব যা আমাদের দুনিয়া এবং আখিরাত কে সকল জায়গায় সফল করবে।

তিনিই আমাদের জন্য আদর্শের এক অনন্য নিদর্শন:-

সকল ক্ষেত্রে তিনি আমাদের জন্য একমাত্র অনুকরনীয় ব্যাক্তি। মহান আল্লহ রব্বুল আলামিন তাকে দিয়েছেন সবচেয়ে সম্মানিত চরিত্র, যা যুগ যুগ ধরে সকল মানবকুল এর কাছে এক সুমহান ব্যাক্তিত্ত। আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।

সুরা আহযাব আয়াত নং ২১

তিনি আরও বলেন,

وَإِنَّكَ لَعَلّي خُلُقٍ عَظِيمٍ

নিশ্চয়ই আপনি চরিত্রে সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছেন।

সুরা কলাম আয়াত নং ৪

মুহাম্মদ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি ব্যাপক , সর্বজনীন ও পরিপূর্ণ জীবন বিধান নিয়ে এসেছেন। যে এই বিধান সমুহ মেনে চলবে, মনে প্রানে বিশ্বাস করবে এবং জীবনের ধাপে ধাপে অনুসরন করবে সে দুনিয়া এবং আখিরাত

দুই জাহানেই সফলকাম। আর এজন্য রসুল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সমস্ত জীবন বা সীরাহ আমাদের জন্য অবশ্যই পালনীয়। তার জীবন আমাদের সামনে খুলে দিয়েছে রবের পাঠানো সেই বিধান এর দরজা। শুধু তাই না তার জীবন কুরআন এর সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। হজরত আয়েশা রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারিত্রিক গুণাবলি সম্পর্কে সত্য ও যথার্থ বলেছেন, তিনি বলেছেন,

فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْآنَ» يک

কুরআনই ছিল আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র।

সহি মুসলিম ৭৪৬, সুনানে আবু দাউদ ১৩৪২।

এ কারনেই তিনি আমাদের জন্য সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত , তিনি ইসলাম এর এক অনন্য প্রতিচ্ছবি, যার অনুসরনে উম্মাহ এর জীবন হবে সফলকাম ।

রসুল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন এক ব্যাক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন যা প্রায় ১৪০০ বছর পর ও সমান ভাবেই জনপ্রিয়। শুধু মুমিন মুসলিম না অন্যান্য ধর্মের মানুষের কাছেও উনি সমাদৃত।

কিন্তু আফসোস হলো আমাদের এখনের প্রজন্ম এর কাছে তার গুনাবলী তার জীবনাচারন অনেক টাই অদৃশ্য। লজ্জার ব্যাপার হলেও সত্য যে অনেক মুসলমান জ্ঞানী ব্যাক্তিও জানেন না কেমন ছিলেন তিনি। কেমন ছিল তার আখলাক, চরিত্র , আচরন, খেদমত ইত্যাদি।

আল্লাহ রব্বুল আল আমিন এর ইচ্ছেয় কিছুটা হলেও এর মাধ্যমে নবিজি কে জানার দাওয়াত ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই এই যাত্রা।

সীরাহ কি ও তার প্রয়োজনীয়তা

সীরাহ :

سار- يسيرُ -سَيرًا < سيرةٌ

سيرةٌ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো পথ বা রাস্তা। আরবীতে সাইর মানে হাটা। কারো জীবন সম্পর্কে জানা মানে তার জীবনে এর উপর ভ্রমন করা বা হেটে চলা। হান্স ডিকশনারি অনুযায়ী সীরাহ অর্থ আচার, আচরন, চাল চলন, মনোভাব, জীবন যাত্রার ধরন,সামাজিক অবস্থা, প্রতিক্রিয়া, কাজকর্মের ধরন ও জীবনী এই সব গুলোই সীরাহ এর অন্তর্ভুক্ত। যার জীবনি পড়ছি তার জীবন অনুসরন করছি, তার জীবনে আমার হেটে বেড়াচ্ছি।সীরাহ বলতে শুধু নবীজির জীবন বুঝানো হয় বিষয়টি এমন না। যেকোন ব্যাক্তি এর জিবনী সীরাহ। যেমন সীরাতে আবু বকর,সীরাতে ওমর মানে তাদের জীবনী। তবে সীরাহ শব্দটির সাথে নবিজি রসুল ﷺ এমন ভাবে জড়ানো বর্তমানে সীরাহ বললেই সীরাতুর রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অনুভব করা হয়।

সীরাহ এর প্রয়োজনীয়তাঃ-

১. আল্লাহ এর হুকুম :-

আল্লাহ রব্বুল আল আমিন কুরআন এ প্রায় ৫০ টি আয়াতে রসুল ﷺ কে আদর্শ হিসেবে মেনে নিতে বলেছে। বলেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা দেন আমরা যেন তা গ্রহণ করি এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন তা যেন আমরা বর্জন করি। বলেছেন আমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতভেদ হলে আমরা যেন আল্লাহ ও তার রাসূলের দিকে ফিরে যাই।

আল্লাহ বলেন-

لَ قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

অর্থ: যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে। (সূরা আল আহযাব, ৩৩:২১)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর-যদি তোমরা আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম। (সূরা আন নিসা, ৪:৫৯)

এভাবে বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ আমাদেরকে বিভিন্নভাবে এই নির্দেশটি দিয়েছেন জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুসরণীয় এবং অনুকরণীয়। আর এটা তখনই সম্ভব যখন আমরা তার জীবনকে পরিপূর্ণরূপে জানব। তার জীবনকে অনুকরণ করতে হলে তাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হলে অবশ্যই সীরাহ জানতে হবে।

২.ইসলামের ইতিহাস জানা :-

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনকে ঘিরেই আছে ইসলামের ইতিহাস। ইসলামের ইতিহাসকে পরিপূর্ণভাবে জানতে হলে সীরাহ জানতে হবে। রাসূলের জীবন শুধুই জীবনী না, তার জীবন, ঘটনা ও পরিস্থিতি মুসলিম জাতির ইতিহাস।

মোহাম্মদ ইবনে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা বলেন আমাদের পিতা সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাসূলুল্লাহ পরিচালিত যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদেরকে শিক্ষা দিতেন, তিনি তিনি

আমাদেরকে রাসুলের সীরাহ পড়ানোর সময় বলতেন এগুলো হলো তোমাদের বাপ দাদাদের ঐতিহ্য, কাজেই এগুলো নিয়ে পড়াশোনা কর।

আলী ইবনে আবু তালিব এর নাতি আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব বলেছেন আমাদেরকে যেভাবে কুরআন শেখানো হয়েছিল ঠিক সেভাবেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনীও পড়ানো হয়েছিল।

অন্যান্য সব নবী রাসুলের জীবন অনেকটাই আমরা কুরআন থেকে জানতে পারি, কিন্তু রাসুলের জীবন জানতে গেলে অবশ্যই তার জীবনী পড়তে হবে।

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসা :-

বর্তমান সময়ের মুসলমানরা অভিনেতা-অভিনেত্রী, খেলোয়াড়, এদের জীবন মুগ্ধতার সাথে অনুসরণ করে। কিন্তু তাদের জীবন থেকে নেয়ার মত কোন পাথেয় নেই। তাদের পথ অনুসরণ করে কোন সফলতাই আসেনা। কিন্তু অবাক করা ব্যাপার রাসূলের জীবনে লুকিয়ে থাকা মনি মুক্তা সম্পর্কে আমরা পুরোপুরি মূর্খ। তার জীবন নিয়ে আমাদের আগ্রহ নেই বললেই চলে। আর যার কারণে তার প্রতি আমাদের ভালোবাসা ও নেই। কারণ কাউকে ভালবাসতে গেলে তার সম্পর্কে জানতে হয়। কাউকে ভালবাসতে হলে তার জীবনকে বুঝতে হয়।

সীরাহ অধ্যায়ন করলে আমরা দেখি তিনি যেমন বাতিল এর বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নিয়েছেন, এমনি মদিনার রাস্তায় শিশুদের হাত ধরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। নাতিদের সাথে সময় কাটিয়েছেন, স্ত্রীর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতাও করেছেন, সাহাবীদেরকে ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষাও দিয়েছেন। সেই ১৪০০ বছর আগে তাহাজ্জুদে শত্রু মিত্র, না দেখা মানুষদের জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করেছেন। এমন মানুষকে ভালো না বাসতে পারা খুব কঠিন কাজ। তার প্রতি এই অকৃত্রিম ভালোবাসা তৈরি হতে হলে সীরাহ জানতে হবে।

৪. কুরআন অনুধাবন করতে সহায়তা করে :-

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর ইন্তেকালের পর কতিপয় সাহাবী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, রসুল ﷺ এর চরিত্র কেমন ছিল? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন "কুরআন ছিল তার চরিত্র "।

এই কথা থেকে বোঝা যায় রাসুলের জীবন কুরআনের প্রতিচ্ছবি।

তার জীবন আমাদেরকে কুরআন বুঝতে সাহায্য করে। তার জীবন পড়লে আমরা জানতে পারবো সূরা আলে ইমরান এর আয়াতগুলো উহুদ যুদ্ধের প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে, সূরা আনফাল এর যুদ্ধ সংক্রান্ত আয়াত বদর যুদ্ধের প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে, সূরা দোহা নাযিল হয়েছে রাসুলের কাছে সাময়িকভাবে ওহী নাযিল বন্ধ হওয়ার প্রেক্ষিতে। সূরা আহযাবের অধিকাংশ আয়াত নাজিল হয়েছে খন্দকের যুদ্ধ নিয়ে, নাজরান থেকে আগত একটি বড় খ্রিস্টান প্রতিনিধিদের দল ও তাদের সাথে কথোপকথনের সমর্থনে সূরা আল ইমরানের আয়াত নাযিল হয়।

৫. হাদিস শাস্ত্র বুঝতে সাহায্য করে :-

হাদিসের গ্রন্থগুলোতে রাসুলের জীবনের ছোট ছোট ঘটনা উল্লেখ করা হয়। কয়েকটি ঘটনা একসাথে করলে সম্পূর্ণ ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। হাদিসের শিক্ষাকে ও বিধি-বিধানকে উপলব্ধি করার জন্য তার জীবন সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হবে। রাসুলের জীবনের সারমর্ম হাদিস শাস্ত্রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৬.মুসলমান হিসেবে নিজেদের পরিচয় গড়ে তুলতে সাহায্য করে :-

সমগ্র মুসলমান জাতি এক উম্মাহ। নিজেদেরকে অবশ্যই মুসলমান পরিচয়েই সবার আগে পরিচিত হতে হবে। বর্তমানে পশ্চিমা সংস্কৃতির যেই অপব্যবহার সমস্ত উম্মাহর উপর জোর করে চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে, তা একজন মুসলমানের জন্য অনুকরণীয় বা অনুসরণীয় নয়। একমাত্র ইসলাম ছাড়া কোনভাবেই এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো সম্ভব নয়।

কিন্তু আফসোসের বিষয় এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ক্ষমতা মুসলমানদের মধ্যে থাকলেও সঠিক ইলমের অভাবে রুখে দাঁড়ানোর মানসিকতা নেই।

কোন পরিস্থিতিতে কিভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে, কোন অবস্থায় নিজের সমস্ত জ্ঞান উজাড় করে দিতে হবে তা বুঝার জন্য অবশ্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন জানতে হবে। যিনি জীবনের প্রথম ৪০ বছর একজন সাধারন মানুষ হিসেবে জীবন যাপন করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী জীবনে রাজনৈতিক নেতা, সামরিক নেতা, ধর্মীয় নেতা, আইন প্রণেতা, শিক্ষক, ইমাম সমস্ত দায়িত্ব সঠিক এবং অবিশ্বাস্য সফলতার সাথে পালন করেছেন। তার জীবন অনুসরণ করাই একজন মুসলমানের জন্য সফলতার সবচেয়ে বড় পাঠ।

সর্বোপরি জীবনে আখলাক ও চরিত্র যাই বলি না কেন, নবীজির চেয়ে অনুসরণীয় আর কোন ব্যক্তি হতে পারে না। একজন মুসলমান একজন মুসলমান হিসেবে কুরআন অনুধাবনের পাশাপাশি, সীরাহ জ্ঞান অর্জন করাও অনেক বেশি জরুরী। উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে সীরাহ অধ্যায়নের গুরুত্ব অপরিসীম।

নবুওয়াত পূর্ববর্তী বিশ্বের অন্যান্য সভ্যতা সমূহ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শুধুমাত্র ইসলাম অথবা মুসলমানদের জন্যই প্রেরণ করেননি। আল্লাহর বাণী সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত মানবজাতির জন্য। আল্লাহ সুবহানাতায়ালা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন মানবজাতির জন্য এক অনন্য রহমত হিসেবে। এর সত্যতার অনুধাবন করতে হলে আমাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের পূর্বে অন্যান্য সভ্যতার অবস্থা সম্পর্কে জানতে হবে। রাসূলের আগমন ও রিসালাত আমাদের জন্য রবের পক্ষ থেকে অনেক বড় একটি নিয়ামত যার সত্যতা বুঝা সহজ হবে।

রোমান সভ্যতা :-

রোমের পূর্বাঞ্চল কে সে সময় বাইজেনটাইন সাম্রাজ্য বলা হত। সাম্রাজ্য ছিল বলকান এশিয়া, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, ভূমধ্যসাগর, মিশর এবং উত্তর আফ্রিকার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে। বাইজেনটাইন এর তৎকালীন শাসক ছিল অত্যন্ত অত্যাচারী ও পশু সুলভ। জনসাধারণের উপরে নানান ভাবে নির্যাতন করতো। মিশরের উপরে চলতো নানারকম ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বৈষম্যমূলক আচরণ। সিরিয়ার উপরে করত জুলুম। ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে তারা নিজেদের সন্তান কেউ বিক্রি করে দিত। সমগ্র রোমানে ছিল অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলা, অশান্তি।

তাদের বিনোদন ছিল বিকৃত। তারা বড় বড় স্টেডিয়ামের মত স্থানে বীভৎস সব বিনোদনের আয়োজন করতো। যেগুলো ছিল বর্বর এবং রক্তক্ষয়ী।

রোমে খ্রিস্টান ধর্ম রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে রোমের অধিকাংশ মানুষ ছিল মুশরিক। সেই সময় যারা খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারে ছিল তাদের উপর চালানো হতো নির্যাতনের স্টিমরোলার। সবচেয়ে বেশি হিংস্র আচরণ ছিল সম্রাট নিরোর। তিনি খ্রীস্টান দের পুড়িয়ে জ্বলন্ত শরীর মোমবাতির মত ঝুলিয়ে শহরকে আলোকিত করত।

প্রায় ৩০০ বছর এমন নিষ্ঠুর নির্যাতনের পর রোমান সম্রাট কনস্ট্যান্টাইন খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়। কিন্তু তিনি যেহেতু মুশরিক ছিলেন তার মধ্যে শিরকি ধ্যান ধারণা ধর্মের ভিতরে ঢুকানোর প্রয়াস চালায়। অবশেষে প্রায় ৩২৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে তিনি আইন জারি করে সেন্ট পল প্রচারিত খ্রিস্টান ধর্মকে রোমের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করে এবং পলের মতবাদের সাথে দ্বিমত পোষণকারী খ্রিস্টানদের হত্যা করে। পরবর্তীতে এই ফলের খ্রিস্টান ধর্মীয় মতবাদ থেকেই অর্থডক্স,ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট ইত্যাদি ধর্মীয় দলের উদ্ভাবন ঘটে।

পারস্য সভ্যতা :-

পারস্য সাম্রাজ্য পারসিক রাজত্ব কিসরাবি রাজত্ব নামে প্রসিদ্ধ ছিল। তাদের সাম্রাজ্য ছিল রোমান সাম্রাজ্যের চেয়েও বড় ও বিস্তৃত। তাদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বিকৃত ধর্মের প্রচলন ছিল যেমন জরাথ্রুস্টবাদ এবং মানীয়বাদ। এরপর খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম দিকে তাদের মধ্যে মানি আবিষ্কার করেছিল পঞ্চম শতাব্দীর দিকে মাজদিকি ধর্মের আবির্ভাব আবির্ভাব ঘটে। এই ধর্মের দাবি ছিল সবকিছু হালাল এর ফলে লুটতরাজ,মহিলাদের বন্দী করে দাসীতে পরিণত করা, জোরপূর্বক খবর অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হয়ে যাওয়া ইত্যাদি কাজ অহরহ হতো। যার ফলে অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে যায় যে এর আগে কখনো এতটা জুলুম হয়নি। তারা নিজেদেরকে খোদার বংশধর মনে পড়তো রাষ্ট্রের সকল আয় তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করত এবং তাদের জীবন ছিল পশুর মত। তাদের মনোভাব ছিল ধ্বংসাত্মক বেশিরভাগ সময় তারা যুদ্ধে লিপ্ত থাকত।

গ্রিক সভ্যতা;-

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অন্যান্য শাস্ত্রে অদ্বিতীয় ও শ্রেষ্ঠ। চিকিৎসা বিজ্ঞান, গণিত শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, দর্শন ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষতায় গ্রিক সভ্যতা ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। তাদের দর্শনশাস্ত্রের ব্যাপক চাহিদা ছিল। সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল, আলেকজান্ডার এর মত ব্যক্তিরা ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সমরনীতিতে বিশ্বের সেরা। সক্রেটিস ঈসা

আঃ জন্মের প্রায় ৪০০ বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন। আলেকজান্ডার প্রাচ্যকে দার্শনিক চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত করে তোলার জন্য মিশরে আলেকজান্দ্রিয়া নামক নগরীর উত্থান করেন। সেখানে ফিলিস্তিন অধিবাসীদের বসবাসের ব্যবস্থা করে দেন এভাবে প্রাচ্যের দর্শনভিত্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়। এরা সমস্ত কিছু যুক্তির পাল্লায় মাপতো। বিশ্বের সমস্ত কিছু নিয়ে তারা গবেষণা করতো যার ফলে তারা চরম রকমের পথ বিচ্যুতির শিকার হয়। সৃষ্টিকর্তার ব্যাপারে তারা ছিল একেবারেই অজ্ঞ। নিজেকেই তারা পরিপূর্ণ মনে করত এবং শ্রেষ্ঠ মনে করত। নবী-রাসূলের জ্ঞান ও উপদেশ তাদের কাছে ছিল অপ্রয়োজনীয়। বিবস্ত্র খেলাধুলা উপভোগ, ব্যভিচার, নাচ গান, হিংস্র পশুদের সাথে লড়াইয়ের দৃশ্যে তারা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। তাদের স্বভাব-প্রকৃতি এতটাই নীচ ছিল যে অভিজাত বংশের লোকেরা সমকামিতায় লিপ্ত হতো।

ইউরোপিয়ান সভ্যতা ঃ - এখনকার ইউরোপ আমরা যেরকম দেখি তখন ইউরোপ এরকম ছিল না। পূর্ব ইউরোপ থেকে শুরু করে পশ্চিম ইউরোপ পর্যন্ত শুধুই ছিল মূর্খতা, দরিদ্রতা ও পঙ্কিলতা। জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্প থেকে তারা ছিল অনেক দূরে। তাদের নিজস্ব কোন চিন্তাশক্তি ছিল না।প্রাচ্যের প্রধান গির্জা ছিল কনস্টান্টিনোপল, একে বলা হত অর্থটিক চার্চ। এর পাদ্রীকে বলা হতো প্যাট্রিক। আর পশ্চিম আগে যাকে বলা হত ক্যাথলিক চার্চ যার ধর্মগুরু ছিল। তারা পরস্পর নিজেদের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে পরস্পরকে আঘাত করত। মতদ্বন্দ্বের কারণে সম্পর্কের খুব খারাপ অবস্থা ছিল। এদের মধ্যে কিছু মানুষ তাদের দিন ও ইমান বাঁচাতে বনে জঙ্গলে আশ্রয় নিত এদেরকেই রাহেব বা সন্ন্যাসী বলা হতো। পাদ্রী ও রাহেব এর একটি বড় অংশ সমাজ থেকে দূরে থাকতে পছন্দ করত।

সবকিছু মিলিয়ে ইউরোপের শেষ সময় ছিল বিশৃঙ্খলা, বিক্ষিপ্ততা, এলোমেলো সভ্যতা।

মিশরীয় সভ্যতা :-

পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলোর মধ্যে মিশরীয় সভ্যতা একটি। এই সভ্যতার অনেক পুরানো পুরানো পুরাকীর্তি এখন পর্যন্ত প্রত্নতাত্ত্বিক রা আবিষ্কার করে চলছে। বিস্ময়কর পিরামিড, স্ফিংস এর মূর্তি এসব তখনকার মিশরের প্রযুক্তি কতটা উন্নত ছিল তা বুঝার জন্য যথেষ্ট। ইরানি, গ্রিক, ও রোমান রা বারবার মিশরের উপরে হামলা করত। রোমানদের শাসনামলে মিশরে খ্রিস্টান ধর্ম প্রবেশ করে। মিশরের জনগণের একটি বড় অংশ খ্রিস্ট ধর্মের দীক্ষিত হয়। তবে মিশরের খ্রিস্টান ধর্ম আরবের মূর্তি পূজার চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। মিশরীয়দের তা অন্যান্য যে কোন দেশের মূর্তিপূজারীদের চেয়েও জঘন্য ছিল। তাদের মধ্যে ছিল বাজে রকমের দাসপ্রথা, ব্যভিচার, রাহাজানি এমনকি নরহত্যা ছিল মামুলি ব্যাপার।

ভারতীয় সভ্যতা :-

জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত শাস্ত্র, দর্শন শাস্ত্র ইত্যাদিতে ভারতীয়দের কৃতিত্ব ছিল অনেক বেশি। আশোক, চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্যদের মতো বড় বড় রাজারা ভারত শাসন করত। কিন্তু রাসুলের জন্মের প্রায় ১০০ বছর আগে ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম বিদায় নেয়ার অবস্থায় ছিল। তার স্থান দখল করে নিচ্ছিল ব্রাহ্মণ ধর্ম। ধর্ম কর্ম ও রাজনীতির দিক থেকে তারা অনেক বেশি পিছানো ছিল। তাদের উপসনালয় গুলো ছিল লম্পটে ভরপুর। তাদের মতি পূজার অবস্থা ছিল ভয়াবহ। এমনকি রাজাদের মধ্যে সহোদরা বিবাহের রীতি ও ছিল। গাছপালা, সূর্য, নক্ষত্র, পাহাড় পর্বত, সাপ, পাথর এমনকি তারা লিঙ্গের পূজাও করতো।

নবুওয়াত পূর্ববর্তী আরব

সীরাহবিদ গন সীরাহ সাধারণত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের সময়কাল থেকে শুরু করেন না। বরং আদি পিতা ইব্রাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘটনা ও আরবদের তৎকালীন অবস্থা দিয়ে শুরু করেন।

প্রাচীন আরব :-

ইতিহাসবিদগণ আরবদেরকে দুটি বড় ভাগে ভাগ করেছেন।

১.আল আরবুল বা বিলুপ্ত আরব

২.আল আরাবুল বাকিআহ বা অবশিষ্ট আরব।

আল আরবুল বাকিয়াহ বা অবশিষ্ট আরবদেরকে আবার দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়।

১. কাহতানি আরব

২. আদনানী আরব

আল আরবুল বায়িদাহ :-

বায়িদাহ শব্দের অর্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত। তাদের নানান রকমের পাপাচারের কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। এরা আরবদের প্রাচীন জনগোষ্ঠী ছিল।এদেরকে আরব হিসেবে নামকরণ করার কারণ ভূখণ্ডকে পরবর্তীতে আরব বলা হয়।

কাহতানি আরব:-

কাহাতান নামক জনৈক ব্যক্তি থেকে এদের নামকরণ করা হয় কাহতানি। কাহতানিদের উদ্ভব ঠিক কোন সময় হয়েছিল তা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। তবে তারা আদনানীদের বহু পূর্বে উদ্ভূত হয়েছে। তারা আরব ভূখণ্ডের দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ ইয়েমেনে বাস করত তাই তাদেরকে দক্ষিনা আরব ও বলা হতো।

আদনানী আরব :-

আদনানীদের বংশধারা থেকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম হয়েছে।তাই তাদের সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। আদনান ছিল মূলত ইসমাইল আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধর। ইসমাইল আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আদনানের মাঝে কত প্রজন্মের ব্যবধান তা নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। ইমাম তবারী রাহিমুল্লাহ সাতটি মত উল্লেখ করেছেন। আদনানের বিষ প্রজন্মের পর একই বংশে রসূলের জন্ম হয়। তাদের প্রকৃত ভাষা আরবি ছিলনা তারা মূলত আরবি শিখেছিল কাহতানীদের কাছ থেকে। তারা আরবের মধ্যভাগে বসবাস করত এবং মধ্যভাগে বসবাস করার কারণে,তারা বিভিন্ন আরব গোত্রের কাছাকাছি আসে তাদের কৃষ্টি এবং সংস্কৃতি গ্রহণ করে। তাদের রক্তে আরব এবং অনারবের মিশ্রণ ঘটেছে।

মক্কা ও জমজম কূপের ইতিহাস

ইব্রাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘিরেই মক্কার ইতিহাস তৈরি হয়েছে। তাই মক্কার ইতিহাস জানতে হলে আমাদেরকে ইব্রাহিম আঃ এর সময়ে চলে যেতে হবে। ইব্রাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন ইরাকের উর অঞ্চলের বাসিন্দা। সেখান থেকে তিনি ফিলিস্তিনি হিজরত করেন এবং ফিলিস্তিনিকে নিজ দাওয়াতি কাজে কেন্দ্রস্থলে পরিণত করেন। দাওয়াতি কাজের জন্য উপযুক্ত জায়গার সন্ধান করতে করতে উনি বিভিন্ন দেশে সফরে ব্যস্ত থাকেন। এভাবেই একদিন তিনি মিশরে যান এবং তার সাথে থাকে তার স্ত্রী সারা। বিভিন্ন ঘটনার পর মিশরের রাজা নিজের মেয়ে হাজেরা কে সারার খেদমতের জন্য দিয়ে দেয়।এ নিয়ে বিভিন্ন মতভেদ আছে। কেউ বলেন হাজেরা ফেরাউনের দাসী ছিল। আল্লামা সুলাইমান মানসুরপুরী অনেক গবেষণা চালিয়ে প্রমাণ করেছেন যে হাজেরা ফেরাউনের মেয়ে এবং একজন মুক্ত নারী ছিলেন।পরবর্তীতে হাজেরার গুণে মুগ্ধ হয়ে ইব্রাহিম আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে হাজেরার বিয়ে দেন। ইব্রাহিম আঃ কে আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বপ্নের মাধ্যমে হাজেরা ও ইসলাম ইসমাইল আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাবা প্রাঙ্গনে রেখে আসার নির্দেশ দেওয়া হয় । ইব্রাহিম আঃ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নির্দেশে হাজেরা এবং তার শিশু পুত্র ইসমাইল আঃ কে মরুভুমির মধ্যে কাবা প্রাঙ্গনে রেখে আসেন। সেখানে এক পর্যায়ে সমস্ত খাবার ও পানীয় শেষ হয়ে গেলে ইসমাইল আঃ পিপাসা ও ক্ষুধা নিবারণের জন্য হাজেরা ছটফট করতে থাকেন। সাফা এবং মারওয়া পর্বতের মাঝখানে পানির আশায় দৌড়াদৌড়ি শুরু করেন। এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অসীম দয়ায় জমজম কূপের সূত্রপাত হয়।
পরবর্তীতে মূলত জমজম কূপের উপর পাখির উড়াউড়ি দেখেই যুরহুম গোত্র যারা মূলত যাযাবর গোত্র ছিল, তারা সেখানে উপস্থিত হয়। এবং সেখানে পানির অস্তিত্ব দেখে তারা হাজেরার কাছে বসতি স্থাপনের অনুমতি চায়। এবং হাজেরা তাদেরকে বসতি স্থাপনের অনুমতি দেয়। পরবর্তীতে এই জায়গাটি মক্কা নামে পরিচিতি লাভ করে।

ইব্রাহিম আঃ যখন ও তার শিশু পুত্রকে মক্কায় রেখে ফিরে আসছিলেন তখন তিনি কাবার দিকে ফিরে একটি দোয়া করেন, তার দোয়াটিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে স্থান দিয়েছেন।

"হে আমাদের পালনকর্তা, আমি নিজের এক সন্তানকে তোমার পবিত্র গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় আবাদ করেছি; হে আমাদের পালনকর্তা, যাতে তারা নামায কায়েম রাখে। অতঃপর আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করুন এবং তাদেরকে ফল-ফলাদি দ্বারা রুযী দান করুন, সম্ভবত তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে"।

(সূরা ইব্রাহিম, ১৪:৩৭)

এই দুআর মধ্যে চমৎকার একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো, আর তা হল ইব্রাহিম আঃ তাঁর পরিবারের সদস্যদের যেসকল চাহিদা পূরণের জন্য ক্রমান্বয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করেছেন সেগুলো হল-

আধ্যাত্মিক চাহিদা (নামায), সামাজিক চাহিদা (মানুষকে আকৃষ্ট করা), শারীরিক চাহিদা (রুযী)। অথচ মানুষের চাহিদা সংক্রান্ত একটি জনপ্রিয় থিওরী হল- Maslow's Hierarchy of Needs. এখানে বলা হয়েছে মানুষের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হল শারীরিক চাহিদা, এরপর সামাজিক চাহিদা এবং সবশেষে আধ্যাত্মিক চাহিদা। এখান থেকে বোঝা যায়, একজন মুমিন তার চাহিদাগুলিকে কোন ক্রমে প্রাধান্য দিবে এবং তার জীবনের সবচেয়ে বড় চাহিদা কোনটি। আর ইব্রাহিম সবশেষে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কথা বলে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমাদের জীবনের সকল চাহিদা পুরণের জন্য আমরা যেন আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

ইব্রাহিম আ: এর মক্কায় আগমন :-

ইব্রাহিম আ: তার স্ত্রী এবং শিশু পুত্রকে রেখে যাওয়ার পর ঠিক কতবার এসেছিলেন, তবে অনেকের মতে তিনি চারবার মক্কায় আগমন করেন।

প্রথম আগমন করেছিলেন যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে স্বপ্ন দেখালেন যাতে তার পুত্র ইসমাইল আঃ কুরবানী করেন। তিনি মক্কায় যান এবং ইসমাইল আঃ কে তার ইচ্ছার কথা জানান ইসমাইল আ: আল্লাহর নির্দেশ বুঝতে পেরে ছুরির নিচে গলা রাখতে রাজি হয়ে যান। মূলত এটা ছিল তাদের জন্য একটি পরীক্ষা। অবশেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার পক্ষ থেকে একটি জান্নাতি প্রাণীকে কোরবানি হিসেবে পাঠান এবং এভাবেই তারা আল্লাহর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

পরবর্তীতে ইসমাইল আ: জুরহুম গোত্রের একজন মেয়েকে বিয়ে করেন। ইব্রাহিম আ: যখন আসেন ইসমাইল আ: বাড়িতে ছিলেন না। তিনি পুত্রবধুর কাছে সংসারের অবস্থা জানতে চান। তিনি তাদের সংসারের অভাব-অনটনের অভিযোগ প্রকাশ করেন। ইব্রাহিম আ: তার ছেলেকে ঘরের চৌকাঠ পরিবর্তন করতে বলেন। তার ছেলে ঘরে ফিরে এই নির্দেশ পেয়ে বুঝতে পারে তার পিতা কি বুঝিয়েছেন এবং তার স্ত্রীকে তালাক দেন।

পরবর্তীতে তিনি আবার আসেন যখন ইসমাইল আ: দ্বিতীয় বিয়ে করেন। তিনি এসে তার পুত্রবধুর কাছে সংসারের অবস্থা জানতে চান, তার পুত্রবধূ আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। এবং এতে ইব্রাহিম আ: খুশি হন।

চতুর্থবার তিনি যখন আসেন তখন তার সাথে তার পুত্রের দেখা হয়। তিনি যখন আসেন তখন তার ছেলে ইসমাইল আ: জমজম কূপের কাছে বসা ছিলেন। এরপর আল্লাহর আদেশক্রমে একত্রে কাবা ঘর নির্মাণ করেন এবং কাবাঘর নির্মাণ শেষে ইব্রাহিম আ: বিশ্ববাসীর কাছে হজের দাওয়াত দেন। কাবা নির্মাণের সময় তিনি এই দোয়া করেন,

"স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল কা'বাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করছিল। তারা দোয়া করেছিলঃ পরওয়ারদেগার! আমাদের থেকে কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ। পরওয়ারদেগার! আমাদের উভয়কে তোমার আজ্ঞাবহ কর এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি অনুগত দল সৃষ্টি কর, আমাদের হজ্বের রীতিনীতি বলে দাও এবং আমাদের ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারী। দয়ালু।"
(সূরা বাকারা, ২:১২৭-১২৮)

কাবা নির্মাণ শেষ হলে ইব্রাহিম আ: তাঁর বংশে সর্বশেষ নবী প্রেরণের জন্যও দূয়া করলেন এবং আল্লাহ সেই দূয়া কবুল করে নবীজিকে বনু ইসমাঈলের মধ্যে থেকে পাঠালেন। ইব্রাহিম আ: এর এই দূয়া আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন-
হে পরওয়ারদেগার! তাদের মধ্যে থেকেই তাদের নিকট একজন পয়গম্বর প্রেরণ করুণ যিনি তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দিবেন। এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয় তুমিই পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা। (সূরা বাকারা, ২:১২৯)

জমজম কূপ নতুন করে উদ্ধারের ইতিহাস :-

জমজম কূপের ইতিহাসের সাথে আরেকটি নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত তা হলো আব্দুল মুত্তালিব।
তার আগে জেনে নেই কিভাবে জমজম কূপ হারিয়ে গিয়েছিল। ইসমাইল আ: এর মৃত্যুর পর বনু যুরহুম এবং বনু ইসমাইলের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। তাদের মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং এই যুদ্ধে বনু যুরহুম জয়লাভ করে। মক্কাবাসীর উপর তাদের আধিপাত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং তারা মানুষের উপরে শুরু করে নানান রকমের নির্যাতন। তাদের এই নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে গেলে মক্কার সকল গোত্র একসাথে হয়ে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় এবং তাদেরকে মক্কা থেকে তাড়িয়ে দেয়। মক্কা থেকে পালানোর আগে

তারা কাবা ঘরের ভেতরে সকল সম্পদ ভেতর ফেলে দেয়। ও এমনভাবে জমজম কূপকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় চিহ্ন আর কেউ খুঁজে পায় না।

দীর্ঘ প্রায় ৩০০ বছর তা বিলুপ্ত অবস্থায় থাকে। আব্দুল মুত্তালিব এর মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পুনরায় তা মানবজাতির সামনে নিয়ে আসে। আব্দুল মুত্তালিবের মাধ্যমে যমযম কূপ পুনরুদ্ধারের ঘটনাটি আব্দুল মুত্তালিব এভাবে বর্ণনা করেছেন-

“এক রাতে আমি হাতীমের মধ্যে ঘুমিয়ে আছি। এমতাবস্থায় এক অচেনা আগন্তুক এলেন এবং আমাকে বললেন, বাররাহ খনন কর। আমি জিজ্ঞেস করলাম, বাররাহ কী? আগন্তুক এর কোন জবাব না দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পরদিন রাতেও সেই আগন্তুক এসে বললেন, মাদনূনাহ খনন কর।আমি জিজ্ঞেস করলাম, মাদনূনাহ কী? আগন্তুক কোন জবাব না দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পরদিন স্বপ্নে সেই আগন্তুক আবার এলেন এবং বললেন, তায়্যিবা খনন কর। আমি বললাম, তায়্যিবা কী? আগন্তুক কোন জবাব না দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। চতুর্থদিন স্বপ্নে সেই আগন্তুক আবার এলেন এবং বললেন, যমযম খনন কর। আমি বললাম, যমযম কি? তিনি বললেন, "যে কূপের পানি কখনো কমে না বা শুকায় না, যা সর্বোচ্চ সংখ্যক হাজীকে খাবার পানি সরবরাহ করতে পারবে, যা অবস্থিত গোবর ও রক্তের মাঝখানে (অর্থাৎ- তা দুধের কাজ করবে অথবা এর অর্থ- যার অবস্থান ভাগাড় ও কুরবানীস্থলের মাঝে) সাদা ডানাবিশিষ্ট কাক ও পিঁপড়ার বাসার নিকটে।"

আগন্তুক তাঁর কাছে যখন যমযম কূপের পরিচয় ও স্থান স্পষ্ট করে দিল এবং স্বপ্নের সত্যতা সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ রইলো না, তখন পরদিন সকালে পুত্র হারিসকে সাথে করে কোদাল নিয়ে সেখানে গেলেন। হারিস ছাড়া তখন তাঁর আর কোন পুত্র জন্মগ্রহণ করেনি। যমযম কূপ খননের কাজ এগিয়ে চললো। যখন আবদুল মুত্তালিব সেই প্রস্তরটি দেখতে পেলেন যা থেকে কূপ উৎসারিত হয়েছে তখন আনন্দের আতিশয্যে 'আল্লাহু আকবার' বলে চিৎকার করে উঠলেন। কুরাইশরা ঐ ধ্বনি শুনে বুঝতে পারলো যে, আবদুল মুত্তালিব যা খুঁজছেন তা পেয়ে গেছেন। যমযম কূপ

আবিষ্কারের পর সবাই তাঁর কাছে এসে বললো, "হে আব্দুল মুত্তালিব, ওটা তো আমাদের পিতা ইসমাইলের কূপ। এতে আমাদেরও হক আছে। আপনি আমাদের কে এই কূপের অংশীদার করুন!" আবদুল মুত্তালিব বললেন, "আমি তা পারবো না। এ জিনিসটা শুধু আমাকে দেয়া হয়েছে, তোমাদেরকে নয়।" তারা বললো, "আমাদের সাথে ন্যায় সঙ্গতভাবে ফায়সালা করুন। তা না হলে আমরা চূড়ান্ত বোঝাপড়া না করে আপনাকে ছাড়বো না।" আবদুল মুত্তালিব বললেন, "বেশ, তাহলে তোমাদের ও আমার মধ্যে এই বিরোধ মীমাংসার জন্য যাকে খুশী সালিশ মানো। আমি তার ফায়সালা মেনে নিতে প্রস্তুত।" তারা বললো, "সিরিয়ার দিকে বনু সা'দ ইবনে হুযাইম গোত্রে এক জ্যোতিষিণী আছে। সে-ই আমাদের সালিশ।" আবদুল মুত্তালিব বনু আবদ মানাফ গোত্রের কিছু লোককে সাথে নিয়ে সেখানে রওনা দিলেন। প্রতিটি কুরাইশ গোত্রের একজন করে লোক গেল তাঁর সাথে। সমগ্র যাত্রাপথটা ছিল মরু অঞ্চলের ভেতর দিয়ে। হিজাজ ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী এক মরুভুমিতে পৌঁছতেই আবদুল মুত্তালিব ও তাঁর দলের লোকদের পানি ফুরিয়ে গেল। পিপাসায় তাদের এমন শোচনীয় দশা হলো যে, বাঁচার আর কোন আশাই রইলো না।

আবদুল মুত্তালিব নিজেদের সম্ভাব্য শোচনীয় পরিণতির কথা চিন্তা করে সহযাত্রীদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, "এখন আমাদের কী করা উচিত বলে তোমরা মনে কর?" সহযাত্রীরা এক বাক্যে বললো, "আমরা শুধু আপনার মতানুসারে কাজ করবো। আপনি যা ভালো মনে করেন নির্দেশ দিন।" তিনি বললেন, "আমি মনে করি, আমাদের গায়ে এখনো যেটুকু শক্তি আছে তা দিয়ে প্রত্যেকে নিজের কবর খুঁড়ে রাখি। অতঃপর যখন একজন মারা যাবে, তখন আমরা যারা জীবিত থাকবো তারা তাকে ঐ কবরে নিক্ষেপ করবো এবং মাটি ঢেকে দেবো"। সবাই একবাক্যে আবদুল মুত্তালিবের সিদ্ধান্তের প্রশংসা করলো এবং সবাই নিজ নিজ কবর খুঁড়লো। অতঃপর পিপাসার দরুন অবধারিত মৃত্যুর অপেক্ষায় সবাই বসে প্রহর গুনতে লাগলো। কিছুক্ষন পর আবদুল মুত্তালিব তাঁর সঙ্গীদেরকে বললেন, "আল্লাহর কসম, একেবারেই নিশ্চেষ্ট বসে বসে কোথাও না গিয়ে এবং জীবন বাঁচানোর কোন অবলম্বন না খুঁজে অসহায়ভাবে মৃত্যুর

কবলে নিজেদেরকে এভাবে সঁপে দেয় ভীষণ কাপুরুষতা। এমনও তো হতে পারে যে, আল্লাহ কোন স্থানে আমাদের জন্য পানির ব্যবস্থা করে দেবেন। অতএব, চল, পানির খোঁজ শুরু করা যাক।" তাঁর সাথে সবাই একমত হল এবং একেকজন পানির খোঁজে একেকদিকে বেরিয়ে পড়ল।কিছুক্ষণ পর আব্দুল মুত্তালিব পানির খোঁজ পেলেন। তিনি সওয়ারি ওঠাতে গিয়ে দেখেন এর পায়ের নিচ থেকে মিঠা পানির ফোয়ারা ছুটছে। অতঃপর আবদুল মুত্তালিব ও তাঁর সঙ্গীরা সওয়ারী থেকে নেমে পানি পান করলেন এবং মশকগুলো পূর্ণ করে পানি ভরে নিলেন। এরপর আবদুল মুত্তালিব কুরাইশদেরকে ডেকে বললেন, “এসো, আল্লাহ আমাদের পানি পান করিয়েছেন। তোমরাও পানি পান করে যাও ও মশক ভরে নিয়ে যাও।" তারা এলো এবং পানি পান করে ও মশক ভরে নিয়ে গেল। অতঃপর তারা বললো, "হে আবদুল মুত্তালিব, আল্লাহর কসম, আমাদের ওপর তোমার প্রাধান্য চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়ে গেছে। আমরা যমযমের ব্যাপারে আর কখনো তোমার সাথে কলহ করবো না। আমরা বুঝতে পেরেছি, যিনি আজ তোমাকে এই মরুভূমিতে পানি পান করিয়েছেন, তিনিই তোমাকে যমযমের পানি পান করিয়েছেন। অতএব তুমি পুনরায় তোমার পানি পান করানোর মহান কাজে দ্বিধাহীনভাবে নিয়োজিত হও।”

আবদুল মুত্তালিব ফিরে চললেন এবং সেই কাফিলার অন্য সবাই মক্কায় ফিরে চললো। এভাবে মূলত যমযম কূপের মালিকানা লাভের মাধ্যমেই আব্দুল মুত্তালিব কুরাইশদেরও নেতৃত্ব লাভ করেন।

কুরাইশদের উৎপত্তি :-

মক্কা ছিল ওই ইয়েমেনের বাণিজ্যিক রাস্তা। কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা গ্রীষ্মকালে শামে সফর করত এবং শীতকালে ইয়েমেনে সফর করতো। তাদের বিশাল বড় পণ্য সামগ্রী কাফেলা থাকতো এবং এইসব পণ্য বহন করার জন্য প্রায় আড়াই হাজারেরও বেশি উট থাকতো। হজ এর মাস গুলোতেও ভিড় থাকতো হাজীদের। কুরাইশরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তাদের সেবা করত। আর এই সময় তাদের ব্যবসায় অনেক বেশি লাভ হতো। আর ইয়াসরিব বা বর্তমান মদিনা ছিল আরবের দ্বিতীয় বৃহৎ শহর। মদিনা ছিল মূলত কৃষি প্রধান অঞ্চল। মদিনাতে কিছু মানুষ ব্যবসা করত তাদের মধ্যে ইহুদিরা ছিল এগিয়ে। আরবের তৃতীয় বৃহৎ শহর ছিল তায়েফ।তায়েফে মূলত বনু সাকিফ গোত্র বসবাস করত। তায়েফের আবহাওয়া ছিল অনেক বেশি নির্মল আর ফলমূল এবং সবজির জন্য তায়েফ ছিল বিখ্যাত। মক্কার অনেক সর্দাররা তায়েফে বাগান কিনে রাখত ও সেখানে সময় কাটাতো।

আরবের ধর্মীয় অবস্থা

মূর্তি সংক্রান্ত শিরক :-

আরবে মূর্তি পূজার সূচনা হয় আমর বিন লুহাই আল খুজাই এর মাধ্যমে। আনুমানিক প্রথম খ্রিস্টপূর্ব অর্থাৎ রসূলের জন্মে প্রায় ৫০০ বছর আগে আমর বিন লুহাইএর মাধ্যমে সমগ্র আরবে মূর্তি পূজা শুরু হয়। তিনি মক্কা থেকে সিরিয়া ভ্রমণ করে এবং সেখানে সভ্যতার মানুষের সাথে তার পরিচয় হয়। তখনকার সময়ে আমালেক সভ্যতার মানুষ ছিল ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তিতে সবার শীর্ষে। তাদের উন্নতি দেখে তার মনে হল মূর্তি পূজা করে এবং তাদের সমস্ত শক্তির উৎস হলো এই মূর্তিগুলো। তিনি তাদের কাছে একটি মুর্তি চায় এবং তারা তাকে হুবাল নামক একটি মূর্তি দিয়ে দেয়। তিনি হুবালকে নিয়ে মক্কায় ফিরে আসে এবং কাবা ঘরের সামনে স্থান দেয়। এবং সে সবাইকে নির্দেশ দেয় হুবালকে পূজা করার জন্য। এই হুবাল ছিল আরবের প্রথম

মূর্তি এবং প্রধানমুর্তি।ধীরে ধীরে সমগ্র আরবে শত শত মূর্তি তৈরি হতে থাকে। এক পর্যায়ে এমন অবস্থা তৈরি হয় যে প্রতি গোত্রের একটা একটা প্রধান মূর্তি এবং অনেক অনেক সহযোগী মূর্তি থাকে।

মূর্তি পূজারীরা মূর্তির পাশে বসে নানান রকম অনুনয় বিনয় করে এবং তাদের অভাব অভিযোগ মূর্তির কাছে পেশ করে। তারা ধারণা করত মূর্তি তাদের হয়ে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে। তারা মূর্তিগুলোকে কেন্দ্র করে তাওয়াফ করতো, সিজদা করত এবং হজ্জ সম্পাদন করতো। মূর্তির জন্য তারা মানত করত এবং কোরবানির পশু তাদের জন্য উৎসর্গ করত।

তীর সংক্রান্ত শির্ক :-

ভবিষ্যৎ গণনার জন্য তারা বিভিন্ন রকমের তীর ব্যবহার করতো। ভিন্ন ভিন্ন তীরের গায়ে তারা হ্যাঁ না ব্যর্থ এগুলি লিখে রাখত। এবং যেই তীর উঠত তারা সেই অনুযায়ী কাজ করতো ।

ভবিষ্যৎ গননা সংক্রান্ত শিরক :-

তাদের মধ্যে গনক,জ্যোতিষী, জাদুকর ছিল। তারা দুষ্টু জিনের মাধ্যমে নানা রকম ভেলকি দেখাতো। ফলে তাদের উপর ছিল মানুষের অগাধ বিশ্বাস। তারা জ্যোতিষীদেরকে মনে করত অনেক বড় কাহিন ও ক্ষমতাধর।

সামাজিক অবস্থা

নারীদের অবস্থা :-

জাহিলি যুগের সমাজব্যবস্থা ছিল মূলত এবং গোত্র ভিত্তিক। মহিলাদের কোনরকম কোন মূল্যায়ন হতো না। উচ্চ বংশীয় মহিলাদের গণ্য করা হতো কিন্তু নিম্ন বংশের মহিলাদেরকে তারা নানান রকম অত্যাচার করত।

তাদের ইচ্ছা ও মতামতের কোন মূল্যায়ন হতো না। বেদুইন আরব মহিলারা পুরুষের সঙ্গে খামারে কাজ করত এবং পশু পালনের কাজ করতো। নিচু বংশে কোন কন্যা সন্তান জন্ম নিলে লোকলজ্জা এবং অভাব অনটনের জন্য তারা তাদেরকে জীবন্ত কবর দিত। নারী ও শিশুদের মিরাস থেকে বঞ্চিত করা ছিল সামাজিক রীতি। ব্যভিচার এত

বেশি তাদের সাথে হতো যে ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। দুই বোন বিয়ে করার রীতি ছিল তাদের মধ্যে। বিয়ের যত নোংরা পদ্ধতি আছে সমস্ত পদ্ধতি তারা অবলম্বন করত। পতিতাবৃত্তি ছিল একেবারেই সাধারণ বিষয়। দুজন ব্যক্তি তাদের পরস্পরের কন্যাকে বিয়ে করত। দুইজন পুরুষ পরস্পর স্ত্রীকে বিনিময় করে নিত।
তালাকের দিক থেকেও তারা নিজেদের যা ইচ্ছা তাই করতো। যখন ইচ্ছা তখন তালাক দিত, যখন ইচ্ছা তখন তাদের ফেরত নিয়ে আসতো।

এছাড়াও তাদের গোত্রের মধ্যে সব সময় যুদ্ধ এবং হানাহানি চলত। শুধুমাত্র হারাম মাসগুলোকে তারা সম্মান করতো। হারাম মাস শেষ হয়ে গেলে তারা আবারো যুদ্ধে লিপ্ত হত। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল মূলত বাণিজ্যিক।পশু পালন ও তাদের পেশা ছিল। সমাজের সুদের খুব বেশি প্রচলন ছিল। তাদের ইলম এর অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। তারা ইহুদী বা খ্রিস্টানদের মতো আসমানী কিতাবে বিশ্বাস করত না। তারা শিক্ষিত ছিল না। খুব কম সংখ্যক মানুষ পড়াশুনা জানত। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন ওয়ারাকা বিন নওফাল।
তবে তাদের চারিত্রিক দিক থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী চরিত্র লক্ষ্য করা যায়। একদিকে তারা যেমন খুন, ব্যভিচার, ডাকাতি মদ্যপান, জুয়া, অন্যায় এগুলো করত অন্যদিকে তারা গোত্রীয় সম্প্রীতি, দান, অতিথি পরায়ণতা এবং ওদের প্রতি দায়বদ্ধতা ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত ছিল।

রাসুল ﷺ এর জন্ম

নবীজি ﷺ এর জন্মের তারিখ নিয়ে সিরাহবিদদের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ আছে। মক্কার প্রখ্যাত বনু হাশিম বংশে আব্রাহার বাহিনীর ধ্বংস হওয়ার ৫০ থেকে ৫৫ দিন ৫৭০ খ্রীস্টাব্দে পর ৯ই রবিউল আউয়াল সোমবার সুবহে সাদিকের সময় আবু তালিবের ঘরের জন্মগ্রহণ করেন। ৯ই রবিউল আউয়াল শফিউর রহমান মোবারক পুরী আর রাহীকুল মাখতুমে উল্লেখ করেছেন। সিরাতে ইবনে ইসলামের মাঝে ইবনে হিসাম রাহি: ১২ই রবিউল আউয়াল এবং ইদ্রিস কান্ধলভী রাহি : সিরাতে মুস্তফা গ্রন্থে ৮ই রবিউল আউয়াল এর কথা বলেছেন। ইবনে ইসহাক রাহি :১২ই রবিউল আউয়াল এর কথা বলেছেন।

এক ইহুদী পাদ্রী শিশু আহমেদের খোঁজে কুরাইশদের এক মজলিসে এসে জানতে চাইলো আজ রাতে কি তোমাদের কারো পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে? তারা উত্তর দিল আমরা জানিনা। ইহুদি তখন খবর নেয়ার অনুরোধ করে বলল আজ রাতে এই উম্মতের নবীর জন্মগ্রহণ করার কথা। তার দুই কাঁধের মাঝে নবুয়তের সিল মারা থাকবে। তারা খোঁজ নিতে গেল এবং এসে ইহুদি কে জানালো আব্দুল মুত্তালিবের মৃতপুত্র আব্দুল্লাহর ঘরে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে।

মুহাদ্দিস ও ইতিহাসবিদদের ভাষায় একে বলা হয় ইরহাসাত,নবীজির জন্মের আগে তার আগমনের লক্ষণ বুঝানোর জন্য পৃথিবীর নানা প্রান্তে অলৌকিক কিছু ঘটনা ঘটে। নবীজির মা আমিনার ভাষ্যমতে নবীজি যখন মাতৃগর্ভে আগমন করেন তখন তাকে সুসংবাদ প্রদান করা হয় যে, আপনার গর্ভের সন্তান এই উম্মতের নেতা হবেন। তার জন্মের পরে বলবেন আমি আমার সন্তানকে সকল হিংসুকের অনিষ্ট থেকে এক আল্লাহর আশ্রয়ে সমর্পণ করছি। আর তার নাম রাখবেন মুহাম্মদ। তিনি আরো বলেন মুহাম্মদ আমার গর্ভে আসার পর আমি দেখতে পাই আমার দেহ থেকে একটি আলো বের হয়েছে। সেই আলোয় সিরিয়ার বশরা শহরের প্রাসাদ সমূহ আমার চোখের সামনে

উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। নবীজি যখন তার গর্ভে থাকে তখন তার মায়ের ভাষ্য মতে তার কোন শারীরিক কষ্ট ছিল না।

পিতার ইন্তেকাল :

নবীজির জন্মের আগে তার পিতা আব্দুল্লাহ কে দাদা আব্দুল মুত্তালিব ব্যবসার কাজে পাঠান। তিনি নবীজীকে গর্ভাবস্থায় রেখে যান। ঘটনা ক্রমে সেখানেই তার ইন্তেকাল হয় ।

দুধ পান ও শৈশব :-

প্রথমে মা আমিনা, কিছুদিন পর আবু লাহাবের দাসী সুয়াইবা নবীজিকে দুধপান করান। তারপর এই সৌভাগ্য অর্জন করেন হালিমা সাদিয়া রা:।

আরবের সম্ভ্রান্ত পরিবারের নিয়ম ছিল শিশুকে দুধ পান করানোর জন্য আশেপাশে গ্রামে পাঠিয়ে দেয়া হতো। এর ফলে শিশুদের স্বাস্থ্য ভালো থাকতো এবং তারা বিশুদ্ধ আরবি ভাষা শিখে ফেলত। তাই গ্রামের মহিলারা প্রায় সময় নবজাতক শিশু আনার জন্য শহরে যেত। হালিমা সাদিয়া রা. বর্ণনা করেন, আমি তায়েফ থেকে বনু সাদের নারীদের সঙ্গে দুগ্ধপোষ্য শিশুর সন্ধানে মক্কায় আসি। সে বছর দুর্ভিক্ষ চলছিল আর আমার কোলে ছিল আমার সন্তান। কিন্তু দরিদ্রতার কারণে তার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ দুধ ছিল না। সারা রাত সে ক্ষুধায় ছটফট করত আর আমরা তার কারণে নির্ঘুম রাত কাটাতাম। আমাদের একটি উটনীও ছিল, তবে সেটারও দুধ ছিল না। মক্কায় যাওয়ার পথে যে গাধার পিঠে আরোহণ করি, সেটিও এত রুগ্ন ছিল যে, সবার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারছিল না। সফরসঙ্গীরা বিরক্ত হচ্ছিল। এভাবে অনেক কষ্টে সফর সমাপ্ত হয়। মক্কায় আসার পরে এতিম নবীজিকে কোন নারী গ্রহণ করছিলেন না। আর হালিমার সৌভাগ্য তার দুধের স্বল্পতার জন্য তার কাছে কোন নারী সন্তান দিচ্ছিল না। হালিমা তার স্বামীর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নবীজি কে গ্রহণ করে। নবীজিকে গ্রহণ করার সাথে সাথেই বরকত বৃদ্ধি পেতে থাকে। হালিমা রা দুধ এত বৃদ্ধি পায় যে নবীজি

ও তার দুধ ভাই তৃপ্তির সাথে দুধ পান করে ঘুমিয়ে পড়ে। তাদের উটনিও দুধে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তারা মক্কা থেকে ফেরত যাওয়ার সময় তাদের গাধাকে দেখে দলের সফর সঙ্গীরা অবাক হয়ে যায়। সেই সময় তাদের এলাকায় দুর্ভিক্ষ চলছিল। কোন পশু দুধ দিচ্ছিল না। তারা ঘরে প্রবেশ করার সাথে সাথেই সমস্ত বকরিগুলো দুধে পূর্ণ হয়ে যায়। এভাবেই তারা নবীজির বরকত উপলব্ধি করতে পারে।

রসূল ﷺ এর বংশধারা :-

তিনি সেরা মানুষই ছিলেন না বরং তার জন্ম হয়েছিল সেরা বংশে। তিনি। নিজেই বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ ইসমাঈলের বংশধরদের মধ্য থেকে কিনানাকে পছন্দ করেছেন, কিনানার মধ্য থেকে কুরাইশদের মনোনীত করেছেন, কুরাইশদের মধ্য থেকে বনু হাশিমকে মনোনীত করেছেন এবং বনু হাশিম থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন।" সহীহ মুসলিম, তিরমিযী

ভিন্ন এক হাদিসে রাসূল বলেন, "আমি বৈবাহিক সম্পর্কজাত সন্তান, আদম থেকে শুরু করে আমার পিতা-মাতা পর্যন্ত আমার বংশধারায় কোন অবৈধ সন্তান নেই। জাহিলিয়াতের ব্যভিচার আমার বংশকে দূষিত করতে পারেনি।"

রাসুলের পৈতৃক বংশধারা হলো -

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম বিন আব্দে মানাফ বিন কুসাই বিন কিলাব বিন মুররাহ বিন কা'ব বিন লুওয়াই বিন গালিব বিন ফিহর বিন মালিক বিন নাযার বিন কিনানাহ বিন খুযায়মাহ বিন মুদরিকা বিন ইলিয়াস বিন মুযার বিন নিযার বিন মা'আদ্দ বিন আদনান।

রাসূল এর মাতৃবংশধারা হল-

মুহাম্মাদ বিন আমিনা বিনতে ওয়াহাব বিন আব্দে মানাফ বিন যুহরাহ বিন কিলাব...

অর্থাৎ রাসূল এর পিতা ও মাতার বংশ কিলাব পর্যন্ত পৌঁছে এক হয়ে গিয়েছে।

রাসুল সাঃ এর বক্ষ বিদারণ :-

তার মোট কয়বার বক্ষ-বিদারণ হয়েছিল তা নিয়ে মতভেদ আছে। ইদ্রিস কান্দলভী রা: চারবার বক্ষ-বিদারন এর বর্ণনাকে গ্রহণযোগ্য বলে মত দিয়েছেন।

জন্মের চতুর্থ বা পঞ্চম বছরে প্রথমবারের মতো রসূলের বক্ষ বিদারণের ঘটনা ঘটে। একদিন রসূল খেলছিলেন জিবরীল আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসেন ভিন্ন বর্ণনামতে জিব্রিল ও মিকাইল আ: দুজনেই এসেছিলেন। তাকে একটু দূরে নিয়ে শুইয়ে দেন এবং বক্ষ বিদীর্ণ করে হৃদপিণ্ডটি বের করেন। তারপর তা পরিষ্কার করে যথাস্থানে রেখে দেন এর মাঝে মোহরে নবুয়াত স্থাপন করেন। তার খেলার সাথীরা হালিমাকে খবর দেয়। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন আমি রাসুলের বুকে ওই সেলাই এর দাগ দেখেছি। এই ঘটনার পর হালিমা ভীত হয়ে নবীজিকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেন।

দ্বিতীয়বার বয়স যখন ১০ বছর তখন তার বক্ষবিদারন করা হয়। নবুওয়াত লাভের প্রাক্কালে তৃতীয়বারের মতো তার বক্ষবিদারন ধারণ করা হয়।

মিরাজের রাত্রিতে বাইতুল্লাহ থেকে মাসজিদুল আকসা গমনের পূর্ব মুহূর্তে তার চতুর্থ বারের মতো বক্ষ বিদারণ করা হয়।

তবে উপরোক্ত বর্ণনাগুলোর মধ্যে প্রথম ও চতুর্থ বর্ননাই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ, যদিও ইদ্রিস কান্দলভি রা মতে সবগুলো বর্ণনায় সহি ও নির্ভরযোগ্য।

মায়ের মৃত্যু :-

নবীজির বয়স যখন চার বা ছয় তখন বাবার কবর জিয়ারত করে ফেরার পথে আবওয়া নামক স্থানে তার সম্মানিত মা আমিনা দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। নবীজির জন্মের আগেই পিতার ছায়া মাথার উপর থেকে বিদায় নিয়েছিল না হতেই স্নেহ থেকেও তিনি বঞ্চিত হন।

দাদার ইন্তেকাল :-

বাবা মাকে হারানোর পর নবীজির দাদা আব্দুল মুত্তালিব তার ভরণপোষণের দায়িত্ব নেন। তিনি তার দাদার কাছেই প্রতিপালিত হন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন চাচ্ছিলেন

তিনি শুধুমাত্র আল্লাহর রহমতে ছায়ায় প্রতিপালিত হবেন নবীজির বয়স যখন আট বছর দুই মাস দশ দিন তখন তার দাদা আব্দুল মুত্তালিব দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। তিনি মৃত্যুর আগে চাচা আবু তালিবকে ওসিয়াত করে যান মোহাম্মদের দেখভাল এর জন্য। আবু তালিব সেই দায়িত্ব তার মৃত্যু পর্যন্ত পালন করে যান। মূলত আবদুল্লাহ ও আবু তালিব একই মায়ের সন্তান ছিলেন। আপন ভাতিজার প্রতি ভালোবাসা তার বেশি ছিল বলেই তাকে এই ওসিয়াত করে যান।

এছাড়াও জমজম কূপের তদারকের দায়িত্ব তিনি দিয়ে যান তার পুত্র আব্বাস রা এর উপর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরবর্তীতে এই দায়িত্ব তার উপরেই বহাল রাখেন এখনো আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর বংশধররা এই দায়িত্ব পালন করে আসছে।

আবু তালিব এর সাথে বাণিজ্য সফরে গমন :-

নবীজির বয়স যখন ১২ বছর তখন চাচা আবু তালিব তাকে সাথে নিয়ে এক বাণিজ্য সফরে শাম গমন করেন। বসরাতে জার্জিস নামে একজন পাদ্রী বাস করতেন তার আরেকটি নাম ছিল বাহিরা। ঈসাই ধর্ম এবং ইঞ্জিলের উপরে তার অনেক বেশি জ্ঞান ছিল। আবু তালিবের বাণিজ্য কাফেলা দেখেই বাহীরা তার ইবাদত খানা থেকে বের হয়ে আসে এবং সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখে তিনি বুঝতে পারেন যে এই ছেলে একদিন আখেরি জমানার নবী হিসেবে আবির্ভূত হবেন।তিনি আবু তালিবকে এই সুসংবাদ দিলেন। সাথে সাথে আবু তালিব ভীতসন্ত্রস্ত এবং নবীর জীবন নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে যান, সাথে সাথেই কয়েকজন গোলামের সাথে নবীজিকে মক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

ফিজার যুদ্ধ :-

রসুল ﷺ এর বয়স যখন ২০ বছর তখন উকাজ বাজারে এটি সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে একপক্ষে ছিল কুরাইশগণ এবং তাদের মিত্র বনু কিনানা বিপক্ষে ছিল কায়স ও

আয়লান। এই যুদ্ধকে ফিজার যুদ্ধ বলা হয়। বনু কিনানার বাররাজ নামে এক ব্যক্তি আয়লানের তিন লোককে হত্যা করে। এ খবর উকাজ এসে পৌঁছলে উভয় দলের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয় এবং যুদ্ধ বেধে যায়। কুরাইশদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি উভয় পক্ষের নিহতদের বিষয়ে সমঝোতা করেন এবং সন্ধির প্রস্তাব দেন। তারা যুদ্ধের পরিত্যাগ করে সন্ধি করে নেয়। রসূল কিশোর বালক অবস্থায় এই যুদ্ধে গিয়েছিলেন। এই যুদ্ধে তিনি তীর এর আঘাত থেকে তার চাচাদের রক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

হিলফুল ফুজুল বা ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা :

হারবুল ফিজার তথা অন্যায় যুদ্ধ থেকে ফেরার (আনুমানিক চার মাস) পর রাসুল 'হিলফুল ফুজুল' পরিষদ গঠন করেন। পরিষদ গঠনের প্রেক্ষাপট হলো, 'জাবিদ' গোত্রের জনৈক ব্যক্তি কিছু পণ্য নিয়ে মক্কায় আসে। আস ইবনু ওয়াইল তার কাছ থেকে পণ্য কিনে; কিন্তু মূল্য পরিশোধ করতে অস্বীকার করে। জাবিদ লোকটি কুরাইশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কাছে এ ব্যাপারে সহায়তা চাইলে, আস ইবনু ওয়াইলের সামাজিক মর্যাদার কারণে কেউ তার সহায়তায় এগিয়ে আসেনি। জাবিদি তখন কাবার পাশে গিয়ে ফিহরের বংশধর ও বিবেকবান মানুষদের কাছে সাহায্যের ফরিয়াদ করে।এরপর বনু হাসিম, বনু জুহরা বনু তাইম, ইবনু মুররা আব্দুল্লাহ ইবনে জুদানের ঘরে একত্রিত হয়। সম্মানিত মাস জিলকদে তারা আল্লাহর নামে শপথ করে অঙ্গীকার করে। তারা মাসুমের পক্ষে জালিমের বিরুদ্ধে সব সময় ঐক্যবদ্ধ থাকবে। তারা মাসুম ব্যক্তির অধিকার আদায়ের চেষ্টা করবে। এবং তারা তাদের অঙ্গীকারে অটল এবং অবিচল থাকবে। তারা আস ইবনু ওয়াইল এর কাছে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং জাবেদির পণ্য তার থেকে কেড়ে নেয়। এবং তারা এই অঙ্গীকারনামা কে হিলফুল ফুজুল নাম দেন । নবীজি এই চুক্তিতে উপস্থিত ছিলেন। এই চুক্তি দাবিয়ে দিয়ে সত্যকে সমুন্নত করেছিল । হিলফুল ফুজুল আরবের গর্ব।

রসূল ﷺ এর ছাগল চরানো যা ছিল সকল নবীর সুন্নাহ :-

বনু সা'দ গোত্রে দুধ মা হালিমার কাছে থাকা অবস্থায় তিনি ছাগল চরাতে মাঠে যেতেন। মক্কাতেও তিনি অর্থের বিনিময়ে ছাগল চড়িয়েছেন। শুধু তিনি না পূর্ববর্তী সকল নবী রাসুলই ছাগল চড়িয়েছেন। জাবির বিন আব্দুল্লাহ বলেন, যাহরান নামক স্থানে আমি রাসূলের সাথে ছিলাম। আমি সেখানে পিলু ফল ছিঁড়ছিলাম। তিনি বললেন, "কালো কালো দেখে ছিঁড়। এগুলো সুস্বাদু হয়ে থাকে”। আমি জিজ্ঞেস করলাম, “আপনি বকরি চরাতেন (যে কারণ আপনি এটা জেনেছেন)?” তিনি বললেন, “এমন কোন নবী ছিল না যিনি ছাগল চরাতেন না”। (সহীহ বুখারী)

আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ইরশাদ করেছেন, "এমন কোনো নবী নেই যিনি বকরি চরাতেন না"। সাহাবাগণ আরয করলেন, "আপনিও?” তিনি ইরশাদ করলেন, "হ্যাঁ, আমিও কয়েক কিরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল চরিয়েছি"। (সহীহ বুখারী)।

ছাগল চরানোর মাধ্যমে নবীগণ দায়িত্বশীলতা, ধৈর্য, অধীনস্থদের সুরক্ষা প্রদান, দূরদৃষ্টি অর্জন, ও মাহর ব্যাপারে যত্নবান হওয়া, অনারম্বর ও সাদাসিধে জীবন যাপন করা, প্রতিকূল পরিবেশেও মানিয়ে নেয়া, আল্লাহর সৃষ্টি ও নিদর্শনের কাছাকাছি থাকা এবং সর্বোপরি মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া উল্লেখিত শিক্ষাগুলো লাভ করেন।

রসূল ﷺ এর শারীরিক গঠন :-

রাসূল ﷺ ,আবু বকর রাঃ , আমির বিন ফুহাইরাহ এবং আব্দুল্লাহ বিন উরাইকিত (পথপ্রদর্শক) হিজরতের সময় পথ চলতে চলতে এক পর্যায়ে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে মরুভূমির মাঝে একটি তাঁবুতে গেলেন। সেখানে উপস্থিত জনৈকা বৃদ্ধার (তার নাম- উম্মে মাবাদ, তিনি পরে মুসলিম হয়েছিলেন) কাছে তিনি খাবার চাইলে বৃদ্ধা জানালেন যে তার কাছে খেতে দেওয়ার মতো কিছুই নেই। অদূরে একটি হাড় জিরজিরে শুকনো বকরিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি বৃদ্ধার কাছে সেটির দুধ দোহন করার অনুমতি দিলেন। বৃদ্ধা হতাশার সাথে অনুমতি দিলেন। রাসূল বকরির ওলানে হাত দেওয়ার সাথে সাথে

তা স্ফীত হয়ে উঠল এবং রাসূল একটি বাটি ভর্তি দুধ দোহন করলেন। সেটি বৃদ্ধাকে খেতে দিয়ে এরপর পুনরায় দোহন করলেন এবং নিজে ও সঙ্গীদের খেতে দিলেন। এরপর পুনরায় দোহন করে এক বাটি ভর্তি দুধ বৃদ্ধার কাছে রেখে বিদায় নিলেন। পরবর্তীতে বৃদ্ধার স্বামী আবু মাবাদ (তিনিও পরবর্তীতে মুসলিম হয়েছিলেন) ঘরে ফিরলে বৃদ্ধা এই আশ্চর্যজনক ঘটনা তার স্বামীকে জানায়। সব শুনে স্বামী কৌতূহলী হয়ে আগন্তুকের ব্যাপারে বিস্তারিত জানার আগ্রহ প্রকাশ করে। উম্মে মাবাদ তখন তার স্বামীকে রাসূল এর যে বর্ণনা দিয়েছিলেন তাকে রাসূল এর ব্যাপারে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম অনুপম বর্ণনা বললেও ভুল হবে না।

উম্মে মাবাদ রা যখন নবীজীকে দেখেন তখন নবীজি যাত্রায় ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় ছিলেন। তিনি বলেন,

একজন মানুষকে দেখলাম

চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্ন,আলোকজ্জ্বল মুখ,

সর্বোত্তম দেহসৌষ্ঠব, পেট অস্বাভাবিক মোটা নয়, মাথার আকার দৃষ্টিকটু ছোট নয়,

চেহারা জীবনভর দেখলেও প্রশান্তি হয় না।সর্বাঙ্গ জীবনভর দেখলেও প্রশান্তি হয় না,তাঁর চোখে ছিল একটি বৈপরিত্য।তাঁর চোখের পাতার লোম লম্বা,তাঁর কণ্ঠে ছিল না কর্কশতা,

তাঁর গলা ছিল পরিমিত লম্বা,তাঁর দাড়ি ছিল পরিপূর্ণ এবং ঘন।কালো অংশ কুচকুচে কালো, সাদা অংশ ধবধবে সাদা মনে হয় যেন চোখের পাতায় সুরমা লাগানো। ভ্রু ছিল মোটা এবং ধনুকের মতো বাঁকানো। দুই ভ্রুর মাঝে জোড়া ছিল না, চুল ছিল কুচকুচে কালো। যখন নীরব থাকতেন তখন এক শ্রদ্ধা পূর্ণ গাম্ভীর্য ভর করত। কথা বলার সময় ছিলেন চমৎকার, ঝলমলে।দূর থেকে তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও স্মার্ট, কাছে থেকে মনে হত তিনি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ।মুখের কথা ছিল সুমিষ্ট, পরিষ্কার, যৌক্তিক।কথার মাঝে ছিল দৃঢ়তা, কথা না ছিল অতি সংক্ষিপ্ত, অস্পষ্ট আর না ছিল অপ্রয়োজনীয় লম্বা।তাঁর কথা শুনে মনে হত যেন নেকলেস থেকে একের পর এক মুক্তো খুলে পড়ছে।মধ্যম গড়নের,তাঁর দিকে তাকানোর জন্য মাথা

নিচু করতে হত না আবার উঁচুও করতে হত না।তিনি ছিলেন দুই ডালের মধ্যে একটি ডাল; অনেকের মধ্যে থাকলে সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং শ্রদ্ধার পাত্র।তাঁর চারপাশে একদল সাহাবি ছিল। যখন তিনি কথা বলতেন তখন তাঁরা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে তা শুনতেন আর যখন তিনি কিছু আদেশ করতেন তখন তাঁরা তা পালনের জন্য ছুটে যেতেন। তাঁর যত্নের ঘাটতি ছিল না, চারপাশে সাহাবিদের ভিড় লেগে থাকত। তাঁর মুখ দুঃখ ভারাক্রান্ত ছিল না,আর না তিনি ছিলেন বাচাল।

খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে বিবাহ :-

মক্কায় তখন খাদিজা নামের একজন সম্পদশালী অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমতি সম্ভ্রান্ত নারী ছিলেন। মহানবীর সাথে বিয়ের আগে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর আরো দুইবার বিয়ে হয়েছিল। তার ২য় স্বামী একজন ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। তখনকার জাহেলি যুগে মহিলারা সম্পত্তির কোন অংশ পেতেন না কিন্তু তাদের কোন সন্তান না থাকায় তার সমস্ত সম্পত্তি খাদিজা রা একাই লাভ করেন।তার সম্পত্তি তিনি ব্যবসায় বিনিয়োগ করা শুরু করেন। তখনকার সময়ে মুদারাবা পদ্ধতিতে ব্যবসা হতো একজন সম্পদ বিনিয়োগ করতেন আর আরেকজন

শ্রম বিনিয়োগ করতেন। ব্যবসার মুনাফার একটি নির্দিষ্ট অংশ বিনিয়োগকারী পেতেন এবং একটি নির্দিষ্ট অংশ শ্রম বিনিয়োগকারী পেতাম। খাদিজা রা সিদ্ধান্ত নেন তিনি বড় অংকের ধন-সম্পদ সহ কাফেলা সিরিয়ায় পাঠাবেন। মহানবীর সত্যবাদিতা, উত্তম চরিত্র, আমানতদারীতা সম্পর্কে তিনি আগে থেকেই জানতেন। মহানবীর কাছে তিনি প্রস্তাব দেন যাতে তার কাফেলা নিয়ে শাম এ গমন করেন। সাথে তার দাস মায়সারা থাকবেন। আবু তালিবের সম্মতিক্রমে তিনি সে প্রস্তাব গ্রহণ করেন । মহানবীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান সফরের পর বৃদ্ধি পেল। তাই তিনি তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। আবু তালিবের সম্মতিতে রসুল ﷺ ও খাদিজা রা: এর বিয়ে সম্পন্ন হয়।

বিবাহের অনুষ্ঠানে আবু তালিব, বনু হাশেমের লোকেরা এবং মুদার গোত্রের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। চাচা আবু তালিব বিবাহের খুতবা পাঠ করেন।

এই খুতবায় তিনি নবীজি স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে বলেন :

'ইনি মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ, যার ধনসম্পদ কম হলেও তাকে মক্কার যে কোনো লোকের সাথে তুলনা করলে নিজ গুণাবলি ও স্বভাব-চরিত্রের কারণে তিনি সমুন্নত থাকবেন। কারণ, সম্পদ ধ্বংসশীল ও প্রত্যাবর্তনশীল। মুহাম্মাদের বংশ-মর্যাদার ব্যাপারে তোমরা সবাই অবগত, তিনি খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদকে বিবাহ করতে চাচ্ছেন। তার পুরো মোহর আমার দায়িত্বে। আল্লাহর কসম, ভবিষ্যতে তিনি অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবেন।'

নবীজি সম্পর্কে চাচা আবু তালিবের এ বক্তব্য সে সময়ের, যখন তাঁর বয়স ২৫ বছর। তখনো বাহ্যিকভাবে নবুওয়ত প্রদান করা হয়নি। আশ্চর্যের বিষয় হলো, আবু তালিব জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তার পুরোনো ধর্মের ওপর অটল থাকেন, যে ধর্ম মিটানোর জন্য নবীজির পুরো জীবন উৎসর্গ হয়। মূলত সত্য কথা লুকানো যায় না।

খাদীজার সংসারের সন্তান :-

খাদিজার গর্ভে নবীজির দুই পুত্র ও চারজন কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাদের প্রথম সন্তান ছিলেন কাসিম। তাই রাসূলের উপনাম ছিল আবুল কাশিম।এরপর যথাক্রমে জন্মগ্রহণ করেন যায়নাব,রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম, ফাতিমা ও আব্দুল্লাহ।

তাদের সকল পুত্র সন্তান শিশু অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। কন্যাদের মধ্যে সকলেই ইসলাম পেয়েছেন মুসলিম হয়েছেন এবং মর্যাদা লাভ করেছেন। একমাত্র ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া বাকি সবার মৃত্যু নবীজির জীবদ্দশায় হয়েছিল।

উম্মুল মুমিনীনগণ :-

রসূল ﷺ এর মোট **১১** জন স্ত্রী ছিলেন। মৃত্যুর সময় পর্যন্ত **৯** জনের সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন।

১.খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ রা :-

আল্লাহু আনহুর জীবদ্দশায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর কাউকে বিবাহ করেননি। হিজরতের তিন বছর আগে তার মৃত্যু হয়। তখন নবিজির বয়স ছিল ৪৯ বছর।

২.আয়িশা বিনতে আবি বকর রা :-

আবু বকর রা: এর কন্যা। ছয় বছর বয়সে নবীজির সঙ্গে তার বিয়ে হয়। প্রথম হিজরীতে ৯ বছর বয়সে তাকে নবীজির সংসারে নিয়ে আসে।নয় বছরের সংসারে কি অর্জন ছিল তা সাহাবীদের বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত। তারা বলতেন আনায় আমাদের সন্দেহ হলে আমরা আয়েশার কাছে সেটা জেনে নিতাম। তিনি ৫৮ হিজরিতে ৬৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

৩, হাফসা বিনতে উমার রা :

তিনি ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কন্যা ছিলেন । প্রথমে খুনাইস বিন হুজাফার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। হিজরতের পর দ্বিতীয় বা তৃতীয় বছরের নবীজির সঙ্গে বিবাহ হয়। তিনি ৪৫ হিজরীতে মদিনায় ইন্তেকাল করেন।

৪.সাওদা বিনতে জাম'আ রা :-

তিনি সাকরান বিন আমরের স্ত্রী ছিলেন। তারপর নবীজির সাথে তার বিয়ে হয়।

৫. যায়নাব বিনতে জাহশ রা :-

তিনি নবীজির ফুফাতো বোন ছিলেন। নবীজি তাকে বিয়ে দিয়েছিলেন জায়েদ বিন হারেসার সাথে। যায়েদ এক সময় তার গোলাম ছিল। কিন্তু এই বিয়ে টিকেনি।নবীজি অনেক বুঝানোর পর ও তাদের তালাক হয়ে যায়। তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশে যায়নাব রা: কে নবীজি বিয়ে করেন। জাহিলি যুগে আরবরা পালক পুত্রকে নিজের পুত্র মনে করতেন। জাহেলী যুগের এই প্রথা আল্লাহর নির্দেশে সেই সময়ই বন্ধ হয়। জায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ২০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৬. যায়নাব বিনতে খুযায়মা রা :-

উম্মুল মাসাকিন উপাধিতে পরিচিত। এর আগে তোফায়েল বিন হারিস এর স্ত্রী ছিলেন। তিনি তালাক দেয়ার পর তার ভাই উবাইদার সঙ্গে বিয়ে হয় এবং ওবাইদা বদর যুদ্ধে শহীদ হয়। এরপর তৃতীয় হিজরীতে উহুদ যুদ্ধের এক মাস আগে নবীজির সঙ্গে বিয়ে হয়। মাত্র দুই মাস পরে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৭. উম্মে সালামা রা :-

তার নাম ছিল হিন্দ। প্রথমে আবু সালামার সঙ্গে বিয়ে হয়। আবু সালামার মৃত্যুর পর নবীজির সাথে চতুর্থ হিজরিতে ভিন্নমতে তৃতীয় হিজরীতে বিয়ে হয়। ৫৮ বা ৬২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। বলা হয়ে থাকে যে উম্মুল মুমিনীনদের মধ্যে সবার শেষে ইন্তেকাল করেছেন উম্মে সালমা রা:।

৮. উম্মে হাবীবা বিনতে আবি সুফিয়ান রা:-

তিনি আবু সুফিয়ানের কন্যা ছিলেন। ওবায়দুল্লাহ বিন যাহাশ সাথে তার বিয়ে হয়। তাদের সংসারের সন্তানও ছিল। কিন্তু হাবশায় হিজরতের পর ওবায়দুল্লাহ ধর্ম ত্যাগ করে। উম্মে হাবিবা ঈমানের উপর স্থির থাকেন তখন হাবশা র বাদশা নাজাশির কাছে চিঠি দিয়ে নবীজি তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। এবং তাদের বিয়ে হয়ে যায়।

৯. মায়মুনা বিনতে আল হারিস রা :-

তিনি মাসুদ বিন ওমরের স্ত্রী ছিলেন। তালাকের পর আবু রুহমেরর সঙ্গে বিয়ে হয় এবং তার মৃত্যুর পর নবীজির সাথে বিয়ে হয়।

১০.জুওয়াইরিয়্যা বিনতে আল হারিস রা :-

বনু মোস্তালিক এর সরদার হাদিসের কন্যা ছিলেন তিনি। যুদ্ধবন্দী হিসেবে তাকে আনা হয় তারপর ষষ্ঠ হিজরীতে নবীজির সঙ্গে তার বিবাহ হয়। তার বিয়ের উসিলায় তার গোত্রের সবাইকে মুক্ত করে দেয়া হয় এবং তার পিতা ইসলাম গ্রহণ করে। তিনি ৫০ বা ৫৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

১১.সাফিয়্যাহ বিনতে হুওয়াই রা:-

হারুন আঃ এর বংশধর ছিলেন তিনি। এটা শুধু তার বৈশিষ্ট্য যে তিনি এক নবীর বংশধর আরেক নবীর পত্নী। তিনি কিনানা বিন আবুল হুকাইকের স্ত্রী ছিলেন। খাইবার যুদ্ধে সে নিহত হওয়ার পর ফ্রিতে তিনি নবীজির সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি ৫০ বা ৫২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

তাদের সাথে যেমন ছিলেন তিনি :-

তাদের সাথে নবীজির সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধু ও শ্রদ্ধা পূর্ণ। অত্যন্ত দরিদ্রতার মাঝে থেকেও তারা কখনো অভিযোগ করেননি।মহানবীর প্রতিটি বিষয়ে তাদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন এবং তাদের সাথে পরামর্শ করতেন। যতই ব্যস্ত থাকুক না কেন স্ত্রী দেরকে যথেষ্ট পরিমাণ সময় দিতেন। প্রতিদিন সকালে তিনি সবার কাছে একে একে গিয়ে সালাম দিতেন ও দোয়া করতেন। আসরের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময় তিনি স্ত্রী ও পরিবারের জন্য বরাদ্দ রাখতেন। তিনি এক দিকে তাদের সাথে মজা করতেন অন্যদিকে তাদেরকে দিনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষা দিতেন।তিনি অনেক বেশি স্ত্রীদের প্রশংসা করতেন এবং সবচেয়ে বেশি প্রশংসা করতেন খাদিজা রা: এর। আনাস থেকে বর্ণিত, "যখনই আল্লাহর রাসূল কোন উপহার

পেতেন, তিনি বলতেন, 'এটি অমুকের কাছে নিয়ে যাও, কেননা সে খাদিজার বান্ধবী। এর কিছু তমুকের বাসায় নিয়ে যাও, কারণ সে খাদিজাকে ভালোবাসে'।" (আদাবুল মুফরাদ)

আয়িশা রাঃ থেকে বর্ণিত, একবার খাদিজার বোন হালা বিনতে খুওয়াইলিদ আল্লাহর রাসূলের ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন। তার গলার স্বর খাদিজার কণ্ঠের অনুরূপ ছিল। এতে রাসূলের খাদিজার কথা মনে পড়ল। তিনি খুশিতে বলে উঠলেন, "হে আল্লাহ! এটা যেন হালা হয়"। আমি ঈর্ষা অনুভব করলাম। বললাম, "আপনি কুরাইশের সে বৃদ্ধা মহিলার কথা এখনও বলেন যার কিনা দাঁত পড়ে গিয়েছিল অনেক আগে যে কিনা মারা গিয়েছে তার আল্লাহ আপনাদের উত্তম আরেকজন দিয়ে তাকে প্রতিস্থাপন করেছেন"। তার মুখের অভিব্যক্তিই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে উঠলো যে আমি তারমধ্যে কেবল আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে দেখতে পেতাম (পূর্ববর্তী জাতিগুলোর মত আজাবের ভয়ে কিংবা তার ওপর যখন ওহী আসতো)। তিনি বললেন, "আল্লাহ আমাকে তার চেয়ে উত্তম কাউকে দিয়ে প্রতিস্থাপন করেননি। সে আমার উপর বিশ্বাস করেছিল যখন লোকেরা অবিশ্বাস করত, সে আমাকে তার সম্পত্তি শক্তি জুগিয়েছিল যখন লোকের আমাকে পরিত্যাগ করেছিল, তার মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে সন্তান দিয়েছেন"। একথা শুনে আয়িশা তাকে বললেন, "যিনি আপনাকে সত্য বাণীসহ পাঠিয়েছেন আমি তার কসম করে বলছি, আজকের পর আমি তার প্রশংসা ছাড়া আর কোন কথা বলবো না"। (আহমাদ, তাবারানি)

এমন আরও অনেক হাদিস রয়েছে যেখান থেকে খাদিজা এর প্রতি রাসূল এর সীমাহীন ভালোবাসার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আয়িশা কেও রাসূল খুবই ভালবাসতেন। এই সংক্রান্ত সমস্ত হাদিস উল্লেখ করতে গেলে

তাতেই একটি বই হয়ে যাবে।

কাবা পুনঃনির্মাণ :-

নবীজির ৩৫ বছর বয়সে কুরাইশরা বায়তুল্লাহকে পুনরায় নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। এটা প্রতিটা গোত্রের জন্যই ছিল সৌভাগ্যের বিষয়। কাজ নিয়ে গোত্র গুলির মধ্যে যাতে বিবাদ না হয় তাই তাদের মধ্যে কাজ বন্টন করে দেয়া হয়। কাজ চলা অবস্থায় একপর্যায়ে কাবা ঘরে হাযরে আসওয়াদ স্থাপনের পালা আসে এবং এটা নিয়ে তৈরি হয় তীব্র মতবিরোধ। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে যে তারা একজন আরেকজনকে হত্যা শপথ নিতে থাকে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য তো নেয় মসজিদের দরজা দিয়ে যে সবার প্রথম প্রবেশ করবে তিনি এর ফয়সালা করবেন। আল্লাহর ইচ্ছায় মহানবী সর্বপ্রথম ওই দরজা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করেন এবং তাকে দেখে সবাই এক বাক্যে বলে ওঠে ইনি তো আলামিন,আমরা তার ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকবো। নবীজি তার বিজ্ঞ জ্ঞান থেকে ফয়সালা করেন যে চাদর বিছিয়ে সেটাতে হাজরে আসওয়াদ রাখেন। প্রত্যেক গোত্রের নির্বাচিত ব্যক্তিকে চাদরের এক একটি প্রান্ত ধরতে বলেন। সবাই এভাবে ধরার পর পাথরটিকে কাবা ঘরে নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর তিনি নিজ হাত উঠিয়ে সেটিকে স্থাপন করেন।

হেরা গুহায় নির্জন বাস :-

মহানবী ﷺ বয়স যখন চল্লিশে পদার্পণ করলেন, ওই সময় থেকে তিনি নির্জনতা প্রিয় হয়ে উঠলেন। খাবার এবং পানি সঙ্গে নিয়ে মক্কা নগরী হতে ২ মাইল দূরে অবস্থিত জাবালে নুর পর্বতের হেরা গুহায় গিয়ে তিনি ধ্যানমগ্ন থাকতেন।

পুরো রমাদান রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেরা গুহায় অবস্থান করেন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইবাদতে ব্যস্ত থাকেন। নবুয়তের সময় ঘনিয়ে আসছিল। ওহীর আগমনের পূর্ব থেকেই সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ নবীগণকে নবুওয়াতের জন্য প্রস্তুত করে থাকেন। হাদিসের মধ্যে এসেছে- “সত্য স্বপ্ন নবুওয়াতের ৪৬ ভাগের ১ ভাগ”।

আয়িশা বলেন, “আল্লাহর রাসূল এর প্রতি সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে ওহীর সূচনা হয়। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন, তা প্রভাতের রশ্মির মতোই স্পষ্ট প্রতিভাত হত”। (বুখারী ও মুসলিম)

ইবনে জামরাহ এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, "এই হাদিসে প্রভাতের রশ্মির কথা বলা হয়েছে কারণ তখনও নবুওয়াতের সূর্যোদয় হয়নি। প্রভাত রশ্মি যেমন সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস, তেমনি সত্য স্বপ্ন হল নবুওয়াত ও রিসালাতের পূর্বাভাস।"

এছাড়াও তাঁর নবুওয়াতের নিদর্শন আরেকটি হাদিস থেকে জানা যায়। জাবির বিন সামুরা বলেন, "রাসূল বলেছেন, মক্কার একটি পাথরের কথা আমার জানা আছে, নবুওয়াতের পূর্বে যেটি আমাকে সালাম করেছিল। এখনও আমি সে পাথরটিকে চিনি”। (সহীহ মুসলিম)

বাস্তবিক অর্থেই রাসূল যখন চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হলেন তখন তিনি খাবার ও পানি সাথে নিয়ে মক্কা থেকে দুই মাইল দূরে অবস্থিত জাবালে নূরের হেরা গুহায় নির্জনে সময় কাটাতে লাগলেন।

আয়িশা বলেন, "অতঃপর তিনি একাকীত্ব ও নির্জনতা প্রিয় হয়ে উঠেন এবং হেরা গুহায় নির্জন অবস্থান গ্রহণ করেন"। মূলত হেরা গুহায় নির্জনে অবস্থান ও একাকী আল্লাহর কাছে সত্য পথের অনুসন্ধানে লিপ্ত থাকাটা আল্লাহর পক্ষ থেকেই তাকে নবুয়তের প্রস্তুতি প্রদানের অংশ ছিল। তিনি কখনো হেরা গুহায় দশদিন থাকতেন বা তার বেশি থাকতেন তারপর তিনি বাড়ি ফিরে আসতেন।

ওহী নিয়ে জিবরীল এর আগমন :-

রাসূল নবুওয়াত লাভের ৩ বছর আগে থেকে প্রতি রমযানে হেরা গুহায় অবস্থান করতে শুরু করেন। এভাবে তৃতীয় বছরে হেরা গুহায় অবস্থানকালে এক রাতে জিবরীল আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী নিয়ে আসেন এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুওয়াত ও রিসালাত লাভ করে ধন্য হন।

জিবরীল আল্লাহর পক্ষ থেকে আগমন করে রাসূল কে বললেন, "তুমি পড়ো”। তিনি বললেন, "আমি পড়তে জানি না"। তখন জিবরীল তাঁকে অত্যন্ত শক্তভাবে ধরে আলিঙ্গন করলেন এবং ছেড়ে দিয়ে বললেন, "তুমি পড়ো”। তিনি আবারও বললেন, "আমি পড়তে জানি না"। এরপর পুনরায় তাঁকে আলিঙ্গন করার পর ছেড়ে দিয়ে বললেন, "পড়ো, সেই প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড থেকে..." এভাবে সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত তেলাওয়াত করে শোনালেন এবং চলে গেলেন। এই ঘটনার পর রাসূল অস্থির চিত্তে ঘরে ফিরে আসলেন এবং স্ত্রী খাদিজার কাছে সবকিছু খুলে বললেন।

সবকিছু শুনে খাদিজা তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, "আল্লাহ কখনো আপনাকে অপমান করবেন না, কেননা আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে আপনি সম্পর্ক রক্ষা করেন, অভাবগ্রস্তদের অভাব মোচনের চেষ্টা করেন, অসহায়দের আশ্রয় দান করে মেহমানদের আদর-যত্ন করেন, অতিথিদের আতিথেয়তা প্রদান করেন এবং ঋণগ্রস্থদের দায় মোচনে সাহায্য করেন, যারা সত্যের পথে থাকে তাদেরকে আপনি সাহায্য করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে অপদস্থ করবেন না।

ইবনু হাজার আসকালানী রাহিমুল্লাহ বলেন এই বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী ব্যক্তি হলেন খাদিজা রা:।

সাময়িকভাবে ওহী বন্ধ হওয়া:-

প্রথমবার ওহী আসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর দিন পর দ্বিতীয়বার ওহী এসেছিল তা নিয়ে বিভিন্ন মতভেদ আছে। কারো মতে ১০ দিন, ৪০ দিন বা ৬ মাস।

এই মত গুলোর মধ্যে দশ দিনের মত থেকেই সফিউর রহমান মোবারক পুরী অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

ওহী বন্ধ থাকার সময় রাসূলুল্লাহ অত্যন্ত চিন্তিত এবং বিচলিত বোধ করতেন। সহীহুল বুখারী শরীফের তাবীর স্বপ্নের ব্যাখ্যা পর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ওহী বন্ধ হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ এতই বিচলিত ও বিব্রতবোধ করতেন এবং তাঁর দুশ্চিন্তা ও অস্বস্তিবোধ এতই অধিক বৃদ্ধি পেত যে, পর্বত শিখর হতে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করার জন্য তিনি মনস্থির করে ফেলতেন। কিন্তু এ উদ্দেশ্যে যখনই তিনি পর্বত শীর্ষে আরোহণ করেছেন তখন জিবরাঈল আ: তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছেন। জিবরাঈল আ: তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছেন, 'হে মুহাম্মদ আপনি আল্লাহর সত্য নাবী।' এতদশ্রবণে তাঁর প্রাণের অস্বস্তি ভাব স্তিমিত হয়ে আসত, মনে লাভ করতেন অনাবিল শান্তি, তারপর ফিরে আসতেন গৃহে। আবারও কোন সময় কিছু বেশীদিনের জন্য ওহী বন্ধ থাকলে একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি হতো।'

ভিন্ন বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল প্রতিদিন হেরা গুহার পাহাড়ে যেতেন জিবরীল কে দেখার জন্য, কিন্তু তাঁর দেখা পেতেন না। এভাবে প্রতিদিন যেতেন এবং ভগ্ন মনে ফিরে আসতেন। একদিন সেখানে গিয়ে কাউকে না পেয়ে পাহাড় থেকে নেমে আসার সময় শুনতে পেলেন তাঁর নাম ধরে কেউ ডাকছে। তিনি সামনে-পেছনে তাকিয়ে কাউকে না পেয়ে আকাশের দিকে তাকালেন এবং সেখানে জিবরীল কে তাঁর আসল রূপে দেখতে পেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন এই সেই ফেরেশতা যাঁকে তিনি হেরা গুহায় দেখেছিলেন। জিবরীল কে স্বরূপে দেখে তিনি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দ্রুত গতিতে বাড়ি ফিরে আসলেন এবং খাদিজাকে বললেন, "আমাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও"। তখন সূরা আল মুদ্দাসসিরের ১-৭ নং আয়াত অবতীর্ণ হয়।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে রাসূল এর উপর দ্বিতীয়বার অবতীর্ণ হয় সূরা মুযযাম্মিল এর প্রথম **১৯** টি আয়াত এবং এরপর সূরা মুদ্দাসসিরের আয়াতগুলি নাযিল হয়। অর্থাৎ সূরা মুযযাম্মিল এবং সূরা মুদ্দাসসির এর মধ্যে কোনটি আগে নাযিল হয়েছে তা নিয়ে মতভেদ আছে।

ইবনে ইসহাক থেকে ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন, প্রথমবার ওহী আসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয়বার রাসূল ﷺ এর উপর সূরা দুহা নাযিল করা হয়। এই সূরায় আল্লাহ রাসূল ﷺ কে নিশ্চয়তা প্রদান করে বলেছেন যে, আল্লাহ তাঁকে পরিত্যাগ করেননি কিংবা তাঁর উপর বিরুপও হননি। বরং রাসূল এর আগামী সময়টা বিগত সময়ের চেয়ে উত্তম হবে। আর তিনি রাসূল এর দুঃখময় ও অসহায় শৈশবের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ কীভাবে তাঁকে লালন পালন করেছেন তাও স্মরণ করিয়ে দেন।

পৃথিবীতে ইসলাম প্রচার

গোপন ইসলাম প্রচার :-

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হওয়ার পর প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করেননি। প্রথমে শুধুমাত্র তার জন্য কিছু বিধান ছিল।পরবর্তীতে যখন আবার ওহী অবতরণ শুরু হলো ইসলাম প্রচারে নির্দেশ দেয়া হয়। আরবদের মধ্যে অহংকারের পাশাপাশি ছিল ধর্মের অন্ধবিশ্বাস। নবীজি তার পরিচিত এবং যারা তার উপর আস্থা করতো এমন লোকদের দেওয়া শুরু করেন।

প্রথমে উম্মুল মুমিনিন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহু, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর যিনি নবীজির চাচাতো ভাই ছিলেন এবং তার পালক পুত্র জায়েদ বিন হারেসা রা: ইসলাম গ্রহণ করেন। অনেকে আগে থেকেই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বন্ধু ছিলেন এবং তার সত্যবাদিতা ও স্বভাব চরিত্রের উপরে তার আস্থা ছিল। আবু বকর তার গোত্রের মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন অনেক মানুষ ভরসা করত। তিনি

ধীরে ধীরে তার গোত্রের মধ্যে কিছু মানুষকে দাওয়াত দিতে থাকেন। ফলে উসমান,আব্দুর রহমান বিন আউফ,সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, জুবাইর বিন আওয়াম এবং তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ রাদি আল্লাহু আনহু তার আহবানে ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে আবু ওবাইদা ইবনুল জাররহ, উবাইদা বিন হারিস, সাইদ বিন যাইদ, আবু সালামা, খালেদ বিন সাইদ বিন আস, ওসমান বিন মাজউন, তার দুই ভাই কুদামা ও আব্দুল্লাহ, আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু। এরা সবাই কুরাইশ গোত্রের ছিল। এ ছাড়াও সুহাইব রুমি,আম্মার বিন ইয়াসির, আবুজর গিফারী ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদি আল্লাহু আনহুম ইসলাম কবুল করেন।

ইসলাম প্রচারের মতো ইবাদত ও শরীয়তের নিয়ম-কানুন পালন হতো গোপনে। মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় ৩০ জনের মতো হয়ে গেলে নবীজি তাদের জন্য প্রশস্ত একটি ঘর নির্ধারণ করেন সমবেত হতেন এবং নবীজি তাদেরকে শিক্ষা দিতেন। ধীরে ধীরে গ্রহনের সংখ্যা বাড়তে থাকলে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের সময় ঘনিয়ে আসে।

প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার :-

তিন বছর পর যখন অনেক নারী-পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মানুষের মধ্যে ইসলাম নিয়ে আলোচনা হতে থাকে, তখন আল্লাহ তাআলা নবীজিকে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের আদেশ দেন। নবীজি সঙ্গে সঙ্গে আদেশ পালনার্থে মক্কার সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে কুরাইশের গোত্রগুলোকে সম্বোধন করে আহ্বান জানাতে থাকেন। সকল গোত্রের লোক উপস্থিত হলে নবীজি প্রথমে তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, 'আমি যদি তোমাদেরকে সংবাদ দিই , ডাকাত-দল তোমাদের ওপর আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছে, তবে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে?' সবাই একবাক্যে বলে উঠল, 'অবশ্যই আমরা আপনার কথা বিশ্বাস করব। কেননা, আমরা আজ পর্যন্ত আপনাকে কখনো মিথ্যা বলতে দেখিনি।'

তখন নবীজি বললেন, 'আমি তোমাদেরকে সংবাদ দিচ্ছি, তোমরা তোমাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস পরিত্যাগ না করলে আল্লাহ তাআলার কঠোর আযাব তোমাদের ওপর আপতিত

হবে।' তিনি আরো বললেন,'আমি যতটুকু জানি, আমি তোমাদের জন্য যে উপহার নিয়ে এসেছি, পৃথিবীর কোনো মানুষ তার জাতির জন্য এরচেয়ে উত্তম উপহার আনেনি। আমি তোমাদের জন্য দীন ও দুনিয়ার কল্যাণ এনেছি। আল্লাহ আমাকে আদেশ দিয়েছেন, আমি যেন তোমাদেরকে তাঁর দিকে আহ্বান জানাই। আল্লাহর কসম, আমি যদি পৃথিবীর সমস্ত লোককে মিথ্যা বলতাম, তবুও তোমাদেরকে মিথ্যা বলতাম না। পুরো পৃথিবীকে ধোঁকা দিলেও তোমাদেরকে দিতাম না। সেই একক পবিত্র সত্তার কসম, যাঁর কোনো শরিক নেই, আমি বিশেষভাবে তোমাদের প্রতি আর সাধারণভাবে পুরো পৃথিবীর প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।'

কুরাইশদের কর্ম তৎপরতা

উতবা ইবনে রাবিয়ার সাথে আলোচনা :-

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, রাসূল ﷺ একদিন মসজিদে হারামে একাকি বসেছিলেন। তখন উতবা ইবনে রাবিয়া কুরাইশদের মজলিসে গিয়ে বলল, "আমি মুহাম্মদের কাছে গিয়ে কিছু আলোচনা করতে চাই। এ ব্যাপারে তোমাদের মত কী? আমি তার সামনে কিছু প্রস্তাব রাখবো। আশা করি সে তার কিছু না কিছু গ্রহণ করবে। সে যে সুবিধা চায়, তা আমরা তাকে দেব। ফলে সে আমাদের নিন্দা করা থেকে বিরত থাকবে।" তারা বলল, "ঠিক আছে তুমি যাও এবং তার সাথে কথা বল।" উতবা এসে রাসূল এর কাছে বসল এবং আলাপ শুরু করল। সে বলল, "হে আমার প্রিয় ভাতিজা! তুমি আমাদের সাথে বংশীয় বন্ধন এবং আত্মীয়তার মর্যাদার দিক দিয়ে কোন পর্যায়ে আছ তা তোমার জানা আছে। তুমি তোমার কওমের সামনে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পেশ করেছ, যা দিয়ে তুমি তাদের দলকে বিভক্ত করছ। তাদের জ্ঞানীদের বোকা সাব্যস্ত করেছ। তাদের ধর্ম দেবদেবীর নিন্দা করেছ এবং তাদের পূর্বপুরুষদের কাফির বলে অভিহিত করেছ। এখন আমার কথা শোনো! আমি কয়েকটি প্রস্তাব তোমার কাছে তোমার বিবেচনার জন্য রাখছি। হয়তো এর থেকে কিছু তুমি গ্রহণ করবে।" তখন রাসূল তাকে বললেন, "বলুন, আমি শুনছি।"উতবা বলল, "আমার প্রিয় ভাতিজা। তুমি যে ব্যাপারটি নিয়ে এসেছ, তার উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে তুমি বিত্তশালী হতে চাও, তাহলে আমরা তোমার জন্য এত সম্পদ ব্যবস্থা করে দেবো যাতে তুমি আমাদের মাঝে সবচাইতে ধনী হয়ে যাও। যদি পদমর্যাদা চাও, তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের নেতা বানিয়ে দেব এবং তোমাকে বাদ দিয়ে কোন ব্যাপারেই আমরা সিদ্ধান্ত নেব না। যদি রাজা হতে চাও, তাহলে আমরা তোমাকে রাজা বানিয়ে নেব। আর যদি মনে করো যে ব্যক্তিটি (জিবরীল) তোমার কাছে আসে, যাকে তুমি দেখতে পাও সে এমন কেউ যাকে তুমি প্রতিহত করতে অক্ষম, তাহলে আমরা তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। এতে আমাদের যত অর্থ খরচ হোক না কেন, আমরা এর থেকে তোমাকে মুক্ত

করবোই"। এভাবে সে আরও নানা কথা রাসূল ﷺ কে বলেন। রাসূল নিবিষ্টচিত্তে তার কথা শুনছিলেন। তার কথা শেষ হলে রাসূল মা বললেন, "হে আবুল ওয়ালীদ। আপনার কথা কি শেষ হয়েছে?" সে বলল, "হ্যাঁ!"

তখন রাসূল প্রশ্ন বললেন, "তাহলে আমার বক্তব্য শুনুন।" এই বলেই তিনি বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা হা-মীম সিজদার ১ থেকে ১৩ নং আয়াত তেলাওয়াত করলেন।

উতবা পিঠের পেছনে হাত রেখে হেলান দিয়ে শেষ পর্যন্ত শুনছিলেন। তারপর রাসূল বললেন, "হে আবুল ওয়ালিদ! শুনলেন তো। এখন আপনি বিবেচনা করুন।" ভিন্ন বর্ণনায় রয়েছে- এই আয়াত পর্যন্ত আসার পর উতবা লাফিয়ে উঠে পড়ল এবং রাসূল এর মুখের উপর হাত চাপা দিয়ে বলল, "আল্লাহর শপথ এবং আমাদের আত্মীয়তার শপথ! এই আযাব যেন আমাদের উপর না আসে"। এই কথা বলে উতবা সেখান থেকে কাঁপতে কাঁপতে উঠে গেল এবং কুরাইশ নেতাদের কাছে ফিরে গেল। তখন তারা বলতে লাগল, "আল্লাহর কসম! আবুল ওয়ালিদ যে চেহারা নিয়ে গিয়েছিল, এখন তা থেকে ভিন্ন চেহারা নিয়ে এসেছে।" তাদের কাছে বসলে তারা বলল, "হে আবুল ওয়ালিদ! সেখানকার খবর কী?" উতবা বলল, "সেখানকার খবর এই যে, আল্লাহর কসম! আমি এমন কথা শুনেছি যা ইতিপূর্বে আর কখনো শুনিনি। আল্লাহর কসম, তার থেকে যে কথা আমি শুনেছি, তা একদিন বিপুল খ্যাতি অর্জন করবে। আর যদি কেউ তার ক্ষতি সাধন করে তাহলে তোমরা মনে করবে যে, তারা তোমাদের কাজ সম্পন্ন করে দিয়েছে। আর যদি সে বিজয়ী হয় তবে তার প্রভাব প্রতিপত্তি ও সম্মান তোমাদেরই হবে। তেমন হলে তোমরা সবচেয়ে সুখী ও সৌভাগ্যশালী জাতিতে পরিণত হবে।" একথা শুনে সবাই বলল, "আল্লাহর কসম! সে তোমাকে নিজের কথা দিয়ে জাদু করেছে মনে হচ্ছে। তিনি বললেন এ আমার অভিমত। এখন তোমাদের যা ভালো মনে হয় তাই কর।

কুরাইশদের ব্যঙ্গ বিদ্রুপ :-

কাফিররা রসুল ﷺ কে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা, বিদ্রুপ করা, অপমান করা এমনকি অবজ্ঞা করাও বাদ রাখত না। রাসুলকে কাফিরদের উপহাস করা প্রসঙ্গে আল্লাহ কুরআনে বলেন,

তারা যখন আপনাকে দেখে, তখন আপনাকে কেবল বিদ্রুপের পাত্ররূপে গ্রহণ করে, বলে, এ- ই কি সে যাকে আল্লাহ 'রাসূল' করে প্রেরণ করেছেন?

(সূরা আল ফুরক্কান, ২৫:৪১

বিদ্রূপকারীদের জন্যে আমি আপনার পক্ষ থেকে যথেষ্ট। যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য সাব্যস্ত করে। অতএব অতিসত্তর তারা জেনে নেবে।

(সূরা আল হিজর, ১৫:৯৫-৯৬)

নিশ্চয় আপনার পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের সাথেও উপহাস করা হয়েছে। অতঃপর যারা তাঁদের সাথে উপহাস করেছিল, তাদেরকে ঐ শাস্তি বেষ্টন করে নিল, যা নিয়ে তারা উপহাস করত। (সূরা আল আন'আম, ৬:১০)

অপমান:-

কুরাইশরা রসুল ﷺ কে যেভাবে পারতো সেভাবেই অপমান করত। একদিন উকবা ইবনে আবি মুয়াইত কাবার পাশে রসূলকে দেখতে পেয়ে রসুলের কাপড়ে হেচকা টান মেরে সেটা তার গলায় পেঁচানো শুরু করল, তাকে শাশ্রুত করে মেরে ফেলার জন্য। এই দৃশ্য দেখে আবু বকর রা:

দৌড়ে আসেন এবং তাকে সরিয়ে দিয়ে মহানবীকে বাঁচালেন। আল্লাহর রাসূল অনেক আত্মমর্যাদা সম্পন্ন বোধ মানুষ ছিলেন তাই তিনি তাদের ব্যবহারে অনেক বেশি কষ্ট পেতেন কিন্তু কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করতেন না। তাদের উপেক্ষা করতেন এবং বারংবার তাদের দাওয়াত দিতেন। এমনকি একদিন রসূল সালাত আদায় করছিলেন আবু জেহেলের প্ররোচনায় উকবা ইবনে আবি মুআইত উটের নাড়িভুড়ি নিয়ে আসলো,

যখন আল্লাহর নবী সিজদায় গেলেন তখন তার পিঠের উপর নাড়ি ভুঁড়ি চাপিয়ে দিল। মহানবী সিজদা থেকে উঠতে পারছিলেন না। ফাতেমা রা দূর থেকে দেখতে পেলেন এবং ছুটে আসলেন। এবং আবর্জনা সরিয়ে রসূলকে উঠতে সাহায্য করলেন।

হিজরত

আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরত :-

নবুয়তের চতুর্থ বর্ষের মাঝামাঝি কাফেরদের অত্যাচার ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। পঞ্চম বর্ষে গিয়ে তা সহ্যের সীমা অতিক্রম করার মতো অবস্থাতে দাঁড়ায়। এমন অবস্থায় দ্বীন ইসলাম ও ঈমানের উপর কায়েম থাকা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠলো। তখন আল্লাহ তায়ালা নাজিল করেন,

বলুন, হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যারা এ দুনিয়াতে সৎকাজ করে, তাদের জন্যে রয়েছে পুণ্য। আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত। যারা সবরকারী, তারাই তাদের পুরস্কার পায় অগণিত।

(সূরা যুমার, ৩৯:১০)

এই আয়াত নাযিল করার মাধ্যমে আল্লাহ মুসলিমদেরকে নিরাপদ ভূমিতে পাড়ি জমানোর অনুমতি দিলেন। এই সময় রাসূল সাহাবিদেরকে বললেন, "তোমরা আল্লাহর জমিনের কোথাও হিজরত করে চলে যাও। শীঘ্রই আল্লাহ তোমাদেরকে একত্রিত করবেন"। সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা কোথায় যাব?" রাসূল তখন আবিসিনিয়ার দিকে ইঙ্গিত করলেন এবং বললেন, “সেখানে এক ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ আছে যার সাম্রাজ্যে কেউ কারও উপর যুলুম করতে পারে না"।

এই ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ হলেন নাজ্জাশি, যার প্রকৃত নাম ছিল 'আসহুমা' অথবা 'আসহামা'-অবশেষে নবুওয়াতের ৫ম বর্ষের রজব মাসে ১৬ জন সাহাবির একটি দল আবিসিনিয়ার পথে পাড়ি জমান। এই দলে ছিলেন ১১ জন পুরুষ এবং ৫ জন নারী।

পুরুষ সাহাবিগণ হলেন-

উসমান ইবনে আফফান রা:

আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রা:

যুবায়ের ইবনে আওয়াম রা:

আবু হুযায়ফা ইবনে উতবা রা:

মুসআব ইবনে উমায়র রা:

আবু সালমা ইবনে আব্দুল আসাদ রা:

উসমান ইবনে মাযউন রা:

আমর ইবনে রাবিয়াহ রা:

সুহায়ল ইবনে বায়যা রা:

আবু সাবরা ইবনে আবু রুহম আমিরী রা:

হাতিব ইবনে আমর (ইবনে ইসহাক তাঁর নাম উল্লেখ করেননি, তবে হাফিয ইবনে সায়্যিদুন নাস উল্লেখ করেছেন)

মহিলা সাহাবিগণ হলেন-

রুকাইয়া রা (রাসূল এর কন্যা এবং উসমান এর স্ত্রী)

সাহলা বিনতে সুহায়ল রা (আবু হুযায়ফা এর স্ত্রী)

উম্মে সালামা বিনতে আবি উমাইয়্যা রা: (আবু সালামা এর স্ত্রী)

লায়লা বিনতে আবু হাসমা রা : (আমর ইবনে রাবিয়াহ এর স্ত্রী)

উম্মে কুলসুম বিনতে সুহায়ল ইবনে উমর রা : (আবু সাবরা এর স্ত্রী; ইবনে ইসহাক তাঁর

নাম উল্লেখ করেননি, তবে হাফিয ইবনে সায়্যিদুন নাস উল্লেখ করেছেন) ওয়াকিদী রাহি, এই দলের মাঝে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এর নামও উল্লেখ করেছেন। তবে ইবন ইসহাক এবং হাফিয ইবনে হাজার আসকালানি রাহি, উভয়েই বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় হিজরতকারী দলের মাঝে ছিলেন।

১৬ জনের এই দলটি গোপনে মক্কা থেকে রওনা হলেন। তাদের কেউ বাহনে আবার কেউ হেঁটেই রওনা দিলেন। জেদ্দার সমুদ্র বন্দরে গিয়ে তাঁরা দেখলেন সেখানে দুটি জাহাজ আবিসিনিয়া যাওয়ার জন্য নোঙ্গর করে আছে। পাঁচ দিরহামের বিনিময়ে তারা সাহাবিদের এই দলটিকে জাহাজে তুলে নিলেন। ওদিকে কুরাইশরা খবর পেয়ে সাহাবিদের এই দলটিকে ধরার জন্য রওনা দিল। কিন্তু তারা বন্দরে পৌঁছার পূর্বেই জাহাজ ছেড়ে দিল এবং সাহাবিগণ নিরাপদে আবিসিনিয়া গিয়ে পৌঁছলেন। এই দফায় তাঁরা রজব থেকে শাওয়াল মাস পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেছিলেন।

আবিসিনিয়াতে হিজরতের কিছু কারণ ছিল।সাহাবীরা নিজেদের ঈমান বাঁচাতে এবং সত্যদিনের অনুসারী হয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আশায় মক্কা ছেড়ে হিজরত করেছিলেন। যতই মুসলমানের সংখ্যা বাড়তে শুরু করল ততই কুরাইশদের অত্যাচারের মাত্র বাড়তে লাগলো। আবিসিনিয়ায় হিজরতের আরেকটি প্রধান কারণ ছিল শুধুমাত্র অত্যাচার বা নির্যাতন থেকে বাচার জন্য না, মহানবী চাচ্ছিলেন মক্কার বাইরে ও একটি নিরাপদ ভূমি তৈরি করতে। যে স্থান থেকে নবীজি ইসলাম প্রচার করতে সহায়তা পাবেন।

আবিসিনিয়ার বাদশা নাজ্জাশী ছিলেন একজন ন্যায় পরায়ন বাদশা। তার রাজ্যে জুলুম হতো না তাই দীন পালনের জন্য মুসলমানদের খুব বেশি কষ্ট হবে না। কুরাইশদের সাথে আবিসিনিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। তাই আবিসিনিয়া সম্পর্কে সমস্ত সাহাবীদেরই আগে থেকে জানাশোনা ছিল। মুহাজিররা প্রায় তিন মাস হাবশায় নিরাপদে বসবাস করে। তখন মক্কার কিছু ভুল ঘটনা শুনে এবং মক্কায় ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি পায়। অনেকেই প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকেন। আরবে ইসলাম আরো ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। এবং তখনই মুহাজিররা মক্কায় ফিরে আসে।

আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় হিজরত:-

কিছুদিন পর কাফেরদের নির্যাতনের মাত্রা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ পাওয়ার পর সাহাবীগণ পুনরায় আবিশীনায় হিজরতের প্রস্তুতি নেন। এবার একটি বড় কাফেলা হিজরতের প্রস্তুতি নেয়। এই দফায় তাদের সংখ্যা ছিল ৮৩ জন পুরুষ এবং ১২ জন নারী। আবিসিনিয়র প্রথম মহা জীবদের মধ্যে উসমান ইবনে আফফান এবং মুসআব ইবনে উমাইর রা: দ্বিতীয়বার হাবশায় হিজরত করেননি। এছাড়াও আবু মুসা আশআরী রা: ইয়েমেন থেকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন।

সাহাবিদেরকে আবিসিনিয়া থেকে মক্কায় ফেরানোর জন্য কুরাইশদের চক্রান্ত:-

আবিসিনিয়ায় গিয়ে বাদশাহ নাজ্জাশির কাছে মুহাজির মুসলিমদের নামে অভিযোগ দায়ের করে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য কুরাইশরা আমর বিন আস এবং আব্দুল্লাহ ইবনে রাবি'য়াহ-কে দূত মনোনীত করে। তাদের কাছে নাজ্জাশি এবং তার উপদেষ্টাবর্গের জন্য অনেক মূল্যবান উপহারও দিয়ে দেয় তারা।

নাজ্জাশির দরবারে গিয়ে তারা তাদের সকল মিথ্যা বিবরণ ও মিথ্যা প্রমাণাদি উপস্থাপন করলো আর পুরোহিতগণকে বিপুল পরিমাণে উপঢৌকন প্রদান করল। যদিও সে সকল বিবরণ একেবারেই মিথ্যে ছিল তবুও বিপুল পরিমাণে উপঢৌকন পাওয়ায় পুরোহিতগণ সিদ্ধান্ত নিলেন তারা মুসলিমদেরকে বহিষ্কার করার ব্যাপারে সম্রাটকে পরামর্শ দিবেন। পুরোহিতদের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে কুরাইশ দূতগণ বাদশা নাজ্জাশির দরবারে উপস্থিত হল। তারা বাদশাহ নাজ্জাশিকে বলল- 'হে মহামান্য সম্রাট! আমাদের দেশের কিছু সংখ্যক অবোধ ও অবাচীন যুবক আমাদের দেশ থেকে পলায়ন করে আপনার দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তাঁরা তাদের পূর্ব পুরুষগণের নিকট থেকে বংশপরম্পরা সূত্রে চলে আসা ধর্মমত পরিত্যাগ করেছে। আপনার দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে আপনার ধর্মমতও গ্রহণ করেনি। এ হচ্ছে তাঁদের চরম ধৃষ্টতার পরিচায়ক। শুধু তাই নয়, এরা নাকি একটিধর্মমতও আবিষ্কার করেছে। এর চেয়ে আজগুবি ব্যাপার আর কী হতে

পারে বলুন? আমাদের গোত্রীয় প্রধান এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ, এ সকল অর্বাচীনের পিতামাতা, মুরুব্বি ও আত্মীয়-স্বজনগণ তাদেরকে স্বদেশে ফেরত পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে আমাদের দুজনকে দূত হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে ওদের ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। আমাদের প্রধানগণ এঁদের ভালোমন্দ সম্পর্কে ভালোভাবে বোঝেন এবং তাদের অসন্তোষের ব্যাপারে ওয়াকেবহাল রয়েছেন।'

কুরাইশরা এই প্রস্তাব পেশ করার পর নাজ্জাশির পুরোহিতগণ উপদেশ দিলেন এদের হাতে মুহাজির মুসলিমদের তুলে দেওয়ার জন্য। কুরাইশদের কথা শোনার পর নাজ্জাশি কিছুক্ষণ গভীর চিন্তা করলেন। এরপর বললেন, 'এই বিষয়টির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভের পূর্বে কোন মন্তব্য করা কিংবা সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত হবে না।'

একথা বলেই তিনি মুসলিমদেরকে তার দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য ডেকে পাঠালেন। মুসলিমগণ আল্লাহর উপর ভরসা করে সঠিক তথ্য প্রকাশের জন্য বাদশার দরবারে উপস্থিত হলেন।

সম্রাট নাজ্জাশি তাঁর দরবারে উপস্থিত মুসলিমদের লক্ষ্য করে বললেন, 'যে ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার কারণে যুগ যুগ ধরে পূর্ব পুরুষগণের বংশপরম্পরা সূত্রে চলে আসা ধর্ম তোমরা পরিত্যাগ করেছ এবং এমনকি আমাদের দেশে আশ্রিত হয়েও তোমরা আমাদের ধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন রয়েছ সে ধর্মটি কোন ধর্ম?'

প্রত্যুত্তরে মুসলিমদের মনোনীত মুখপাত্র হিসেবে জা'ফার বিন আবূ ত্বালিব অকপটে বলে চললেন-

'হে সম্রাট! আমরা ছিলাম অজ্ঞতা, অশ্লীলতা ও অনাচারের অন্ধকারে নিমজ্জিত দুষ্কর্মশীল এক জাতি। আমরা প্রতিমা পূজা করতাম, মৃত জীব-জানোয়ারের মাংস ভক্ষণ করতাম, নির্বিচারে ব্যভিচার ও অশ্লীলতায় লিপ্ত থাকতাম, আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে অন্যায় আচরণ করতাম, আমানতের খেয়ানত ও মানুষের হক পয়মাল করতাম এবং দুর্বলদের সহায় সম্পদ গ্রাস করতাম, এমন এক অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজ জীবনে আমরা যখন মানবেতর জীবন যাপন করে আসছিলাম

তখন আল্লাহ রব্বুল আলামীন অনুগ্রহ করে আমাদের মাঝে এক রাসূল প্রেরণ করলেন। তার বংশ মর্যাদা, সততা, সহনশীলতা, সংযমশীলতা, ন্যায়-নিষ্ঠা, পরোপকারীতা ইত্যাদি গুণাবলি এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পূর্ব থেকেই আমরা অবহিত ছিলাম। তিনি আমাদের আহ্বান জানিয়ে বললেন যে, 'সমগ্র জাহানের স্রষ্টা প্রতিপালক এক আল্লাহ ছাড়া আমরা আর কারও উপাসনা করবো না। বংশ পরম্পরা সূত্রে এ যাবৎ আমরা যে সকল প্রস্তর মূর্তি বা প্রতিমা পূজা করে এসেছি সে সব বর্জন করব। অধিকন্তু মিথ্যা বর্জন করা, পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহার করা, অশ্লীল অবৈধ কাজকর্ম থেকে বিরত থাকা এবং রক্তপাত পরিহার করে চলার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। তাছাড়া মহিলাদের উপর নির্যাতন চালানো কিংবা মহিলাদের অহেতুক অপবাদ দেওয়া থেকেও বিরত থাকার জন্য তিনি পরামর্শ দেন। আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা থেকে বিরত থাকার জন্যও তিনি পরামর্শ দেন। অধিকন্তু সালাত, রোযা এবং যাকাতের জন্যও তিনি আমাদের নির্দেশ প্রদান করেন।'

এইভাবে জা'ফার অত্যন্ত চিত্তোদ্দীপক এবং মর্মস্পর্শী ভাষায় ইসলামের মূলনীতি এবং বিধি বিধানগুলো বর্ণনা করলেন। তারপর আবারও বললেন- 'এই পয়গম্বরকে বিশ্বজাহানের প্রতিপালক স্রষ্টা আল্লাহর পয়গম্বর বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছি এবং তার আনীত দ্বীনে এলাহীর অনুসরণে দৃঢ় প্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আল্লাহ এবং তার রাসূল এর অনুসরণ করে চলেছি। সুতরাং আমরা এক ও অদ্বিতীয় প্রভু আল্লাহর ইবাদত ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করি না এবং বিশ্ব জাহানে কোথাও তাঁর কোনো শরীক আছে বলে আমরা বিশ্বাস করি না। পয়গম্বর যেসব কথা, কাজ ও খাদ্য আমাদের জন্য হারাম বলেছেন আমরা সেগুলোকে বিষবৎ পরিত্যাগ করেছি এবং যেগুলোকে হালাল বলেছেন আমরা সেগুলোকে বৈধ জেনে তার সদ্ব্যবহার করছি। এ কারণে আরব সমাজের বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায় আমাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে। তারা চান এ সত্য, সুন্দর, শ্বাশত ও সুনির্মল দ্বীপ থেকে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে অশ্লীলতা এবং অনাচারের গভীর পঙ্কে পুনরায় নিমজ্জিত করতে। কিন্তু আমরা তা অস্বীকার করা অশ্লীলতা এবং অনাচারের গভীর পঙ্কে পুনরায় নিমজ্জিত করতে। কিন্তু

আমরা তা অস্বীকার করায় তারা আমাদের উপর নারকীয় নির্যাতন চালিয়েছেন। এক আল্লাহর ইবাদত থেকে ফিরিয়ে নিয়ে প্রতিমা পূজায় লিপ্ত করানোর জন্য আমাদের উপর আঘাতের উপর আঘাত হেনেছে, নিদাঘের উত্তপ্ত কংকর ও বালুকারাশির উপর শুইয়ে বুকের উপর পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে, জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর শুইয়ে দিয়ে বুকে পাথর চাপা দিয়েছে, পায়ে দড়ি বেঁধে পথে প্রান্তরে টেনে নিয়ে বেড়িয়েছে। এমনকি এইভাবে যখন তারা আমাদের উপর অবিরামভাবে অন্যায় অত্যাচার চালাতে থাকলেন আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে আল্লাহর জমিনকে আমাদের জন্য সংকীর্ণ করে ফেললেন এবং এমনকি আমাদের ও আমাদের দ্বীনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে ও প্রাণনাশের হুমকি দিতে থাকলেন তখন আপনার মহানুভবতা, উদারতা, ন্যায়-নিষ্ঠার কথা অবগত হয়ে আল্লাহর রাসূল সাঃ আমাদের নির্দেশ প্রদান করলেন দেশ ত্যাগ করে আপনার দেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে। হে সম্রাট! আমরা আপনার সহৃদয়, উদারতা ও মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়েছি। আমরা চাই আপনার আশ্রয়ের সুশীতল ছায়াতলে অবস্থান করতে। অনুগ্রহ করে এ সব পাষণ্ড যালেমদের (অত্যাচারীদের) হাতে আমাদের সমর্পণ করবেন না।'

সম্রাট নাজ্জাশি বললেন সেই পয়গম্বর যা এনেছেন তার কিছু অংশ তোমাদের কাছে আছে কি? হযরত জা'ফার বললেন, "জি হ্যাঁ।"

নাজ্জাশি বললেন, "তাহলে আমার সামনে পড়ে শোনাও।"

জা'ফার আল্লাহর সমীপে নিবেদিত এবং আত্মা-সমাহিত অবস্থায় সূরাহ মারিয়ামের প্রথম কয়েকটি আয়াত পাঠ করে শোনালেন। নাজ্জাশি এতই মুগ্ধ হলেন যে, তার চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়ে দাড়ি ভিজে গেলো। জা'ফারের তেলাওয়াত শ্রবণ করে নাজ্জাশির ধর্মীয় মন্ত্রণাদাতাগণও এতই ক্রন্দন করেছিলেন যে, তাদের হাতে রক্ষিত কিতাব পত্রও ভিজে গেলো। অতঃপর তাদেরকে উদ্দেশ্য করে নাজ্জাশি বললেন, ' এ কালাম (বাণী) এবং সেই কালাম যা ঈসা এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিলো, উভয় কালামই এক উৎস হতে অবতীর্ণ হয়েছে।'

এরপর নাজ্জাশি 'আমর বিন 'আস এবং আব্দুল্লাহ বিন রাবী'আহকে সম্বোধন করে বললেন, 'তোমরা যে দূরভিসন্ধি নিয়ে আমার দরবারে আগমন করেছ তা সঙ্গে নিয়েই দেশে ফিরে যাও। তোমাদের হাতে এদের সমর্পণ করার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। অধিকন্তু, এ ব্যাপারে এখানে কোনো কূট কৌশলেরও অবকাশ থাকবে না।'

বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব কে বয়কট :-

আবিসিনিয়া থেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে ফিরে আসার পর কুরাইশগণ রসূল সা: ও সাহাবীদেরকে চিরতরে ধ্বংস করার কৌশল হিসেবে মক্কার সকল গোত্রের সমন্বয়ে বনু হাশেম ও বনু মুত্তালিব গোত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক চুক্তি সম্পাদন করল। তারা প্রথমে বনু হাশেম এবং মুত্তালিব কে বলে মহানবীকে তাদের হাতে তুলে দিতে। রাজি না হওয়াতে তারা তাদের সাথে পুরোপুরি সম্পর্ক ছিন্ন করার শর্ত আরোপ করে। তারা একটি অঙ্গীকারনামা তৈরি করে এবং বলে বনু হাশিম, ও বনু মুত্তালিবকে বয়কট করা হলো। তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক, বিয়ে, বেচাকেনা সব বন্ধ করে দেয়া হবে। এই অঙ্গীকারনামা কাবা ঘরের ভেতরে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। শেষ পর্যন্ত আবু তালিব অপারগ হয়ে রসূল সা: সহ বনু হাশেম ও বন মুত্তালিব গোত্রের সমস্ত মুসলিম এবং অমুসলিম, নারী পুরুষ ও শিশুসহ সবাইকে সঙ্গে নিয়ে গিরি দুর্গ শিবে আবু তালিব এর মধ্যে আশ্রয় নেন।

শিবে আবু তালিব এর বন্দীদশা :-

বন্দী জীবনের তিন বছর অনেক বেশি কঠিন ছিল। খুদা নিবারণ এর জন্য সাহাবীদেরকে গাছের পাতা পর্যন্ত খেতে হয়েছে। সাব ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা: বলেন ক্ষুধার জ্বালায় বন্দী বেশে এক রাতে একটি শুকনো চামড়া আগুনে ঝলসিয়ে চূর্ণ করে পানিতে গুলে পান করেছিলেন। এই তিন বছরে তাদের মধ্যে শিশু পুত্র কন্যা বন্দী অবস্থায় অনেকেই মৃত্যুবরণ করেন। ছোট শিশুরা যখন খুদা পিপাসায় অস্থির হয়ে গগন বিদারী চিৎকার করত তখন তারা অট্টহাসিতে ফেটে পড়তো।

বন্দী দশা থেকে মুক্তি :-

তাদের এই অবস্থা দেখে কিছু ব্যক্তি তাদের হয়ে আলোচনা করতে যায়। আবু জেহেল সাবধান করে দেয় তারা যাতে মোহাম্মদের হয়ে কথা না বলে। তখনই আবু তালিব সেখানে উপস্থিত হয়ে বলেন, 'আমার ভাতিজা আমাকে এক পয়গাম দিয়ে পাঠিয়েছে। তিনি বলেছেন, আপনাদের ওই অন্যায় চুক্তিনামা পোকা-মাকড়ে খেয়ে ফেলেছে; চুক্তির কোনো দফাই আর সেখানে উল্লেখ নেই, একমাত্র আল্লাহ নামটি ছাড়া। আপনারা খবর নিয়ে দেখুন। যদি আমার ভাতিজার কথা সত্যি হয়, তাহলে এ অন্যায় বয়কটের এখানেই শেষ হবে। আর এর অন্যথা দেখা গেলে আমাদের কোনো কথা নেই। তারা গিয়ে দেখল অঙ্গীকারনামায় শুধু বিসমিকাআল্লাহুম্মা কথাটি ছাড়া আর কোন কিছুই অবশিষ্ট নেই।

চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া- রাসুল এর অনন্য মুজিযা:-

কুরাইশরা রাসূল কে নবুওয়াতের নিদর্শন দেখানোর জন্য বারবার চাপ দিচ্ছিল। কুরআন তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তবুও তারা কুরআনকে যথেষ্ট মনে করল না। আল্লাহ জিবরিলের মাধ্যমে রাসূলের কাছে সংবাদ পাঠালেন- যদি তারা নিদর্শন দেখতে চায় তবে আমরা তাদের জন্য চাঁদকে দুই ভাগ করে দেব। রাসূল কাফিরদের তা জানালেন। রাতের বেলা কাফিররা সবাই একত্রে জড়ো হলো। তারা সবাই তাদের চোখের সামনে দেখল- চাঁদ দুই ভাগ হয়ে আবার জোড়া লেগে গেল। এটা ছিল একটা অদ্বিতীয় ও অলৌকিক ঘটনা। বুখারী, মুসলিম এবং কুরআনে এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন- কেয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। তারা যদি কোন নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয়

এবং বলে, এটা তো চিরায়ত জাদু।

(সূরা আল কামার, ৫৪:১-২)

এই দৃশ্য দেখে কুরাইশরা বলতে লাগলো মোহাম্মদ সা: জাদু করেছে। এই দৃশ্য নবীজির অন্যতম মুযিজা।

বেদনার বছর

আবু তালিবের মৃত্যু :-

আবু তালিবের মৃত্যু নিয়ে সীরাহবিদ দের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ আছে। গিরি সংকট থেকে ফিরে এসে আবু তালিবের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকে।বয়কট থেকে মুক্তির ৬ মাস পর নবুয়তের দশম বর্ষে তিনি ইন্তেকাল করেন।

আবু তালিবের মৃত্যুশয্যায় রাসূল তাঁকে বললেন, "চাচাজান! আপনি শুধু একবার লা-ইলাহা- ইল্লালাহু কালিমাটি পাঠ করুন, যাতে আমি বিচারদিবসে আপনার জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারি"।আবু তালিবের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল কুরাইশ নেতৃবৃন্দ। তাদের মধ্যে আবু জাহল এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আবি উমাইয়া বলল, "আবু তালিব! আপনি কি তাহলে শেষ পর্যন্ত আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে বিমুখ হয়ে যাবেন?" এরপর আবু তালিব যাতে কালিমা পড়তে না পারেন এজন্য তারা ক্রমাগত আবু তালিবের সাথে কথা বলতে থাকেন। অবশেষে আবু তালিব মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। মৃত্যুর আগে শেষ যে বাক্যটি তিনি বলেন তা ছিল- "আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর"। আবু তালিবের চার সন্তান ছিল তালিব, আকিল, জাফর রা: ও আলী রা:।

রসুলের চাচা এবং ফুফু:-

আব্দুল মুত্তালিবের ১০ পুত্রসন্তান এবং ৬ জন কন্যাসন্তান ছিল। পুত্রসন্তানগণ হল-

হারিস (একাই এক মা থেকে)

যুবায়ের, আব্দুল্লাহ ও আবু তালিব (একই মা থেকে)

আব্বাস ও দিরার (একই মা থেকে)

হামযা, মুকাওয়াম ও হাযল (একই মা থেকে)

আবু লাহাব (একাই এক মা থেকে)

কন্যাসন্তানগণ হল-

সাফিয়্যাহ

আতিকাহ

উম্মে হাকিম

উমায়মা (যয়নাব বিনতে জাহাশ এর মা)

আরওয়া

বাররাহ

এই ১০ জন পুত্রসন্তানের মধ্যে ৬ জন রাসূল এর নবুওয়াত লাভের পূর্বেই মারা যান। বাকি ৪ জন হলেন-হামজা,আব্বাস রা: ও আবু তালিব,আবু লাহাব। এই ৪ জনের মধ্যে হামজা ও আব্বাস ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আবু তালিব ও আবু লাহাবের ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য হয়নি। এখানে একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য, হামযা ও আব্বাস- উভয় শব্দের অর্থই 'সিংহ'। আবার আবু তালিবের আসল নাম ছিল 'আব্দে মানাফ' এবং আবু লাহাবের আসল নাম ছিল 'আব্দুল উযযা'। মানাফ ও উযযা ছিল কুরাইশদের দুটি দেবীর নাম।

নবীজির ৬ জন ফুফুর মধ্যে নিশ্চিতভাবে ইসলাম গ্রহণের কথা জানা যায় সাফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব রা:। বাকি চারজনের বিষয়ে তেমন কিছু জানা যায় না।

খাদিজা রা: এর মৃত্যু :-

খাদিজা রা: নবুয়তের দশম বর্ষের রমাদান মাসের ১০ তারিখে ইন্তেকাল করেন। মাস নিয়ে তেমন কোনো মতভেদ নেই । মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর মতভেদে ৫৩ কিংবা ৫৫ বছর। আবু তালিব এবং খাদিজা রা: এর মৃত্যুর পর কুরাইশদের অত্যাচার আগের চেয়েও অনেক গুণ বেড়ে যায়। একদিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাস্তা দিয়ে হাটার সময় এক পুরাই কাফির এসে তার মাথায় মাটি নিক্ষেপ করে। সেই অবস্থাতেই তিনি ঘরে ফিরে আসেন। তার মেয়ে তার এই অবস্থা দেখে কান্না করতে থাকেন তখন রসূল তাকে উত্তর দেন মেয়ে আমার। তুমি কেঁদো না। আল্লাহই তোমার পিতার হেফাজতকারী। তিনি আরো বলেন যতদিন আমার চাচা আবু

তালিব জীবিত ছিলেন ততদিন আমার সাথে এত খারাপ ব্যবহার করেনি যা আমার সহ্যের বাহিরে ছিল।

সীরাহ বিশেষজ্ঞগনের মতে এই বছর একের পর এক দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়ে যাওয়ার কারণে এই বছরটির নাম হয় আমুল হুযন বা দুঃখের বা শোকের বছর। আবু তালিবের কারণে ঘরের বাইরে তিনি নিরাপত্তা লাভ করেছিলেন আর ঘরের ভেতর প্রশান্তি লাভ করতেন খাদিজা রা এর কারণে।

তায়েফ গমন:-

মক্কার কুরাইশরা যখন নানান ভাবে তাকে নির্যাতন ও অত্যাচার শুরু করল তখন মহানবী নবুয়তের দশম বছরে শাওয়াল মাসে মক্কা থেকে ৬০ মাইল দূরে তায়েফে গমন করেন। তিনি ভেবেছিলেন তায়েফের মানুষ ইসলাম গ্রহণ করবে এবং তাকে সাহায্য করবে। তিনি জায়েদ বিন হারেসা রা কে সাথে নিয়ে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান জানান। কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্য তারা কেউ ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেনি। এবং তারা জালেমের মতো আচরণ শুরু করেন। তারা কিছু বদমাশ লোক কেন নবীজির পিছনে লেলিয়ে দেয়। তারা আল্লাহর রাসূলের উপর পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে। তারা নবীজিকে এতটাই আঘাত করতে থাকে যে নবীজির কদম রক্তাক্ত হয়ে যায়। জায়েদ বিন হারেসা রাদিয়াল্লাহু আনহু পাথরের আঘাত থেকে নবীজীকে রক্ষা করতে থাকেন এতে তিনিও আহত হন। প্রচন্ড আঘাতে যখন নবীজি রক্তাক্ত তখনো তিনি তাদের জন্য বদদোয়া করেনি।

ইসরা ও মিরাজ পরিচয়:-

নবুয়তের দশম বছরে মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে তিনি তার চাচা ও প্রান প্রিয় স্ত্রীকে হারান। মানসিকভাবে তিনি অনেক বেশি কষ্টে ছিলেন। নির্যাতন ও লাঞ্ছনা শিকার করেন হলেন তায়েফবাসীর কাছে। এই বিপর্যস্ত মুহূর্তে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর

প্রিয় রাসূল ﷺ কে তার তার একান্ত সান্নিধ্যে নিয়ে গিয়ে ধন্য করলেন। একমাত্র মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কোন নবী বা রসুলের এই সৌভাগ্য হয়নি।

ইসরা :-

ইসরা রাত্রিকালীন ভ্রমণ। আল্লাহর নির্দেশে রসুল ﷺ জিবরাইল আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একটি বাহনের পিঠে বসে হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত যে নৈশকালীন ভ্রমণ করেছিলেন তাকে বলা হয় ইসরা।

মিরাজ :-

মিরাজ অর্থ উপরে আরোহণের মাধ্যম বা সিড়ি।আল্লাহ তার প্রিয় হাবিব মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একে আকাশে আরোহন করিয়ে প্রথম আকাশ থেকে শুরু করে সপ্তাকাশ ভেদ করে সিদরাতুল মুনতাহা পেরিয়ে তার নিজের কাছে ডেকে নিয়ে ছিলেন।একেই মিরাজ বলে।

ইসরা ও মিরাজ এর সময়কাল :-

ইসরা ও মিরাজের সময়কাল নিয়ে সীরাহবিদগণের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ আছে। নবুয়ত লাভের বছর থেকে পঞ্চম বছর, অষ্টম বছর, দশম বছর বিভিন্ন মত আছে। এমনকি মাস নিয়েও বিভিন্ন মতভেদ আছে।

ইসরার ঘটনা :-

রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবা শরীফের হিজ্‌র বা হাতীমে শোয়া ছিলেন। তার সাথে আরও দু'জন শোয়া ছিলেন। কোন কোন বর্ণনায় তাদের নাম এসেছে, হামযাহ ও জা'ফার (তবে জা'ফার এর বর্ণনাটি ঠিক নয় কারণ সেসময় জা'ফার আবিসিনিয়ায় অবস্থান করছিলেন)। এমতাবস্থায় তিন ফেরেশতা এসে বললেন, এদের মধ্যে কোনটি সে লোক? একজন বলল, মাঝখানে যিনি শুয়ে আছেন তিনি। তারপর তারা চলে গেলেন। ভিন্ন বর্ণনায় রয়েছে- হাতীমেই জিবরীল তাঁর বক্ষ বিদারণ

করেন এবং যমযমে (ভিন্ন বর্ণনায়-ঈমানে) পরিপূর্ণ পাত্র নিয়ে এসে তাঁর হৃৎপিণ্ড ধৌত করে দেন।পরবর্তী দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের সালাত আদায় করে উম্মে হানি (রাসূল এর চাচাতো বোন ও আবু তালিবের কন্যা) এর ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। এমতাবস্থায় ঘরের ছাদ ভেদ করে ফেরেশতাগণ অবতরণ করলেন। জিবরীল আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যমযমের কাছে নিয়ে গেলেন। তারপর তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। রাসূল সা: বর্ণনা করেন- এমন সময় হিকমত (জ্ঞান) ও ঈমানে পরিপূর্ণ একটি স্বর্ণের পেয়ালা আনয়ন করা হলো। আমার বক্ষ হতে পেট পর্যন্ত ফেঁড়ে যমযমের পানি দিয়ে হৃৎপিণ্ড ধৌত করে তা ঈমান ও হিকমতের মাধ্যমে পরিপূর্ণ করে দেয়া হলো"। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, এই সময় তার দুই কাঁধের মধ্যস্থলে মোহরে নবুওয়াত স্থাপন করা হয়। যদি পূর্বেই তার কাঁধে মোহর স্থাপন করা থাকে করা হয়ে থাকে তবে এই দফা মূলত তার মোহরের নবায়ন করা হয়। আল্লাহই ভালো জানেন।রাসূল বলেন, "তারপর আমার নিকট খচ্চরের চেয়ে একটু ছোট এবং গাধার চেয়ে বড় একটি সাদা রঙ্গের বুরাক নামক একটি বাহন আনয়ন করা হল"। তিনি প্রথমে বুরাকে আরোহণ করে মাসজিদুল হারাম থেকে বায়তুল মাকদিস পর্যন্ত ভ্রমণ করলেন। এই বাহনটির গতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাসূল বলেছেন, "দিগন্তে যতদূর পর্যন্ত চোখ যায়, ততদূর পথ সে এক ধাপে অতিক্রম করে"। কোন কোন বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে জিবরীল একই বাহনে রাসূল এর সফরসঙ্গী হয়েছিলেন। তিনি নবীজির পেছনে উপবেশন করেন।শাদ্দাদ ইবনে আউস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল বলেছেন, মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত যাওয়ার সময় পথিমধ্যে এমন এক জায়গা অতিক্রম করে যাই যেখানে প্রচুর খেজুর গাছ ছিল। জিবরীল আমাকে বললেন, "এখানে নেমে সালাত আদায় করুন"। আমি সেখানে নেমে সালাত আদায় করি এরপর জিবরীল আমাকে বললেন, "আপনি কি জানেন আপনি কোথায় নামাজ পড়লেন?" আমি বললাম, "না, তা আমার জানা নেই"। তখন জিবরীল বললেন, "এটি ইয়াসরিব অর্থাৎ মদিনা যেখানে আপনি পরবর্তীতে হিজরত করে যাবেন"। এরপর আমরা সেখান থেকে রওনা হলাম।

পথিমধ্যে অপর একটি স্থানে জিবরীল পুনরায় আমাকে বললেন, “এখানেও নেমে সালাত পড়ুন"। আমি নেমে সালাত পড়লাম জিবরীল আমাকে বললেন, “আপনি সিনা উপত্যকায় মূসা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে সালাত পরলেন। এই গাছেই আল্লাহ তাঁর নূরের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন এবং মূসার সাথে কথা বলেছিলেন। আমরা আবার রওনা হলে পুনরায় এক স্থানে জিবরীল বললেন, "এখানে নেমে সালাত আদায় করুন"। আমি তার কথামতো সেখানে নেমে পড়ি এরপর জিবরীল বললেন, “এটি হচ্ছে মাদইয়ান শহর। এটি ছিল শু'আইব এর এলাকা"। এরপর সেখান থেকে রওনা হওয়ার কিছুক্ষণ পর জিবরীল আবার আমাকে নেমে সালাত পড়তে বললেন। আমি এখানেও সালাত আদায় করলাম। এরপর জিবরীল বললেন, “এটি ঈসা জন্মস্থান- বায়তুল লাহাম(বেথেলহাম)"।

বাইহাকী এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

মিরাজ এর ঘটনা :-

তারপর তিনি জান্নাত থেকে প্রবাল ও পদ্মরাগ পাথরের তৈরি সিঁড়ির মাধ্যমে ঊর্ধ্বাকাশে ভ্রমণ শুরু করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমরা দুনিয়ার আকাশের নিকটবর্তী হলাম। জিবরিল ফেরেশতা আমার সাথেই ছিলেন। উপর থেকে আগমনকারীর পরিচয় জানতে চেয়ে জিজ্ঞেস করা হলো, কে? উত্তরে জিবরিল বললেন, আমি জিবরিল। আবার জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সাথে লোকটি কে? তিনি বললেন, মোহাম্মদ। বলা হলো তাকে কি আসতে বলা হয়েছে? তিনি বললেন হ্যাঁ। আকাশের ফেরেশতাগণ বললেন, স্বাগতম, শুভ হোক তার আগমন। প্রথমে তিনি আদম আ: এর সাথে দেখা করে সালাম দেন।দ্বিতীয় আকাশে যাওয়ার সময় তাকে একই প্রশ্ন করা হয়। সেখানে তিনি ইয়াহিয়া এবং ঈসা আ: এর সাক্ষাৎ পান। চতুর্থ আকাশে গিয়ে ইদ্রিস আ:,পঞ্চম আকাশে হারুন আ:,ষষ্ঠ আকাশে মুসা আ: এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। এবং সপ্তম আকাশে গিয়ে ইব্রাহিম আ: এর সাথে সাক্ষাৎ হয়।

বায়তুল মা'মুর থেকে রাসূল কে আরও উপরে সিদরাতুল মুনতাহায় নিয়ে যাওয়া হয়। 'সিদরাত' অর্থ হল 'কুল গাছ' আর 'মুনতাহা' অর্থ 'সর্বশেষ'। সিদরাতুল মুনতাহা অর্থ 'সর্বশেষ প্রান্তের কুলগাছ'। এটি এমন এক স্থান যে এর নীচ থেকে কোন বস্তু কেবল এই পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। অতঃপর এখান থেকে তা গ্রহণ করা হয়। এবং উপর হতেও কোন বস্তু এই পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর এখান থেকে তা গ্রহণ করা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর আমার জন্যে সিদরাতুল মুনতাহা তথা সীমান্তের কূল বৃক্ষ উন্মুক্ত করা হল। এই বৃক্ষের ফলগুলো ছিল কলসীর ন্যায় বড়। গাছের পাতাগুলো ছিল হাতির কানের মতো বৃহদাকার। অতঃপর সেই বৃক্ষকে স্বর্ণের প্রজাপতি, জ্যোতি ও বিভিন্ন বিচিত্র রঙ আচ্ছন্ন করে ফেলল। ফলে তা এমন রুপে পরিবর্তিত হল যে, কোন সৃষ্টির পক্ষেই তার সৌন্দর্য বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তিনি সিদরাতুল মুনতাহায় জিবরীল ফেরেশতাকে আসল আকৃতিতে দেখলেন। অথচ ইতঃপূর্বে তিনি আরেকবার দুনিয়াতে তাঁকে আসল আকৃতিতে দেখেছিলেন।

সহিহ বুখারীর হাদিসে রয়েছে রাসূল সপ্তম আসমান পেরিয়ে সিদরাতুল মুনতাহায় গিয়েছিলেন, আবার সহিহ মুসলিমের হাদিসে রয়েছে সিদরাতুল মুনতাহা অবস্থিত ৬ষ্ঠ আসমানে। ইমাম নববী এই দুটি সহিহ হাদিসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন এভাবে- সিদরাতুল মুনতাহা বৃক্ষের কাণ্ড শুরু হয়েছে আসমান থেকে কিন্তু এর বিস্তৃত হয়ে শেষ হয়েছে সপ্তম আসমানে। সিদরাতুল মুনতাহা হলো আসমানের শেষ সীমানা। এই সীমানা পর্যন্ত জিবরীল আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাওয়ার অনুমতি আছে। সেখান থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অলৌকিকভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরো উপরে আরোশে আজিমে নিয়ে গেলেন। কোন কোন বর্ণনামতে সিফাতুল মুনতাহাতেই পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করা হয়। কিন্তু সহি বুখারীর হাদিসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট বলেছেন, এরপর আমাকে আরো উপরে নিয়ে যাওয়া হয়।

আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনটি হাদিয়া:

মুসলিম শরীফের হাদিসে রয়েছে, আল্লাহ এসময় রাসূল ﷺ কে তিনটি বিষয় হাদিয়া হিসেবে প্রদান করেন-

১।পাঁচ ওয়াক্ত সালাত

২।সুরা বাকারার শেষ আয়াত গুলো অর্থাৎ শেষ আয়াতগুলোর বিষয়বস্তু এবং

৩।রাসূলের উম্মাতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শির্ক করবে না আল্লাহ তার কবিরা গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। অর্থাৎ কবীরা গুনাহগার জাহান্নামী হবে তবে কাফির-মুশরিকদের মতো চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না বরং কবীরা গুনাহকারীর অনেকেই নবীদের সুপারিশে, কেউ আল্লাহর প্রিয় ফেরেশতাদের সুপারিশে কেউবা নিছক আল্লাহর মেহেরবানীতে ক্ষমা লাভ করবে।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সিদ্দিক উপাধি লাভ :-

এরপর কাফেররা আবু বকর রা.-এর কাছে গিয়ে বলল, 'আপনি কি মুহাম্মাদের এমন উদ্ভট অবাস্তব কথা বিশ্বাস করবেন যে, তিনি এক রাতেই মসজিদুল আকসা পর্যন্ত গিয়েছেন এবং সকাল হওয়ার আগেই মক্কায় ফিরে এসেছেন?' আবু বকর রা. নির্দ্বিধায় জবাব দিলেন, 'অবশ্যই বিশ্বাস করব। আমি তো এরচেয়ে অসম্ভব কথাও বিশ্বাস করি। আমি এ কথা মানি যে, সকাল-সন্ধ্যা মুহূর্তের মধ্যে তাঁর কাছে আকাশ থেকে অহি আসে। সুতরাং এ ঘটনার ব্যাপারে কীভাবে দ্বিধাগ্রস্ত হতে পারি?' এমন তাৎক্ষণিক ও দ্বিধামুক্ত সত্যায়নের কারণে আবু বকর রা.-এর উপাধি দেওয়া হয় 'সিদ্দীক' তথা মহাসত্যবাদী।

দাওয়াত এর ভিন্ন পন্থা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ থেকে ফিরে আসার পর নতুনভাবে দাওয়াত দেওয়া শুরু করেন। তখন হজের মৌসুম ছিল, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তাই আসতে শুরু করল। নবুয়তের চতুর্থ বৎসর থেকে নবীজি হজের সময় দাওয়াত দেন

কিন্তু দশম বছরে তিনি আরো জোর দিয়ে দাওয়াত প্রচার করতে থাকেন। কারণ তিনি বুঝে গিয়েছিলেন মক্কায় থেকে ইসলাম প্রচারের এবং ইসলামী রাষ্ট্র গড়া সম্ভব না। তিনি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য আলাদা ভূমির সন্ধান করছিলেন। তিনি বনু কিন্দাহ, বনু কালব,বনু হানিফা এবং বনু আমির বিন সা'সা'আহ গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দেন। কুরাইশদের কাছ থেকে বিভিন্নভাবে বাধা, অত্যাচার নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিলেন রসুল ﷺ ও তার সাহাবীরা। দাওয়াতী কাজ এর পাশাপাশি রসুল ﷺ নিরাপদ ভুমি এর খোজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আশ্রয় এর সন্ধান করছিলেন হন্য হয়ে । হজের মৌসুমে মিনায় খাজরাজের দল আসে। এবং তাদের মাধ্যমেই ইয়াসরীব এ ইসলাম ধর্মের সুচনা হয়।

আকাবার প্রথম শপথঃ-

প্রথমবার সাক্ষাতের একবছর পর হজের মৌসুমে মদীনার ১২ জন রসুল ﷺ এর সাথে সাক্ষাত করেন। তারা ইসলাম গ্রহন করে রসুল ﷺ এর হাতে বায়াত গ্রহন করেন। ইতিহাসে একে আকাবার প্রথম শপথ বা বাইয়াতুল আকাবা আল উলা এর নামে পরিচিত করানো হয়। ইয়াসরিব থেকে আসা ১২ জন এর মধ্য খাজরাজ থেকে ১০ জন ও আওস থেকে ২ জন ছিলেন। এদের মধ্য ৭ জন ছিল নতুন ,বাকীরা এর আগে এসেছিলেন। এবং এই প্রচেস্টার মাধ্যমেই মূলত আওস ও খাজরাজের মধ্য ঐক্য স্থাপন হয়। তারা মিনার আকাবা নামক স্থান রসুল ﷺ এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।এবং ইসলাম এর পথে চলার অংগীকার করেন। উবাদা ইবনু সামিত আকাবার প্রথম বায়াত এর বর্ননা করতে গিয়ে বলেন, রসুল ﷺ বায়াত নেন আমরা যেন আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করি। চুরি, ব্যাভিচার এবং সন্তানদের হত্যা না করি। কার ও ব্যাপারে যেন অপবাদ আরোপ না করি।সৎ কাজের বিরোধিতা না করি। তিনি বলেন কোন ভালো কথায় আমাকে অমান্য করবেনা। বায়াতের বিষয়গুলা দিয়ে পরবর্তীতে নারীদের বায়াত দেয়া হয় তাই একে বায়াতুন নিসা ও বলা হয়।হজ শেষ হয়ে গেলে রসুল ﷺ তাদের সাথে মুসআব ইবনু উমায়ের কে পাঠান। তিনি মক্কা থেকে যাওয়া

প্রথম ধর্মপ্রচারক, তিনি তাদের কুরআন ও সালাত শিক্ষা দিতেন তাই তাকে মুকরি বা শিক্ষক ডাকা হতো।

আকাবার দ্বিতীয় শপথঃ-

নবুয়তের ১৩ তম বছরে আকাবার প্রথম শপথের পরের বছর হজের মৌসুমে ইয়াসরিব এর ৪০০ জনের ও বেশি অমুসলিম এবং ৭০ জন এর ও অধিক মুসলমান হজ পালন করতে মক্কায় আসেন। মুসলমান গন রসুল ﷺ এর সাথে যোগাযোগ করা শুরু করলেন। জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন আমরা বলাবলি করতাম আর কতদিন রসুল ﷺ কে মক্কার পাহাড়গুলোতে ভীত সন্তস্ত্র অবস্থায় ঘোরাঘুরি করতে দেখব। তারা আইয়ামে তাশরীক এর মধ্যবর্তী দিবাগত রাতে রসুল ﷺ এর সাথে দেখা করার সময় নির্ধারণ করে। রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর রসুল ﷺ এর নিকট আকাবায় একত্রিত হয়। সংখ্যায় তারা ছিল ৭৩ জন পুরুষ এবং দুইজন মহিলা। মহিলা দুজন ছিল উম্মু উমারা নুসাইবা বিনতে কাব ও উম্মু মানী আসমা বিন্তে আমর।রসুল ﷺ তার সাথে আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব কে নিয়ে আসেন। এবং তিনি অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও ভাতিজার নিরাপত্তার খাতিরে উপস্থিত হন। এবং তিনি প্রথম ভাষণ শুরু করেন। কাব রা: রসুল ﷺ কে বায়াত দিতে বলেন। এই বাইয়াত নিয়ে জাবির রা বলেন হে আল্লাহুর রাসূল আমরা আপনার নিকট কোন বিষয়ে শপথ করব?

নবিজি বলেন,

সুখে দুখে সর্বাবস্থায় আল্লাহর কথা শুনবে ও মেনে চলবে। অভাব ও সচ্ছলতায় একই ধারায় খরচ করবে। ভালো কাজের জন্য আদেশ করবে, মন্দ কাছ থেকে বিরত থাকবে। আল্লাহর পথে দন্ডায়মান থাকবে এবং আল্লাহর ব্যাপারে কোন নিন্দাকারীর নিন্দাকে পরোয়া করবে না। যখন আমি তোমাদের নিকট হিজরত করে যাব, তখন আমাকে সাহায্য করবে এবং যেমনভাবে আপন জান মাল ও সন্তানদের হেফাজত করছো সেভাবেই আমাকে হেফাজত করবে। এসব করলে তোমাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। আকাবার প্রথম শপথে ছিল শিরক ও কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার

অঙ্গীকার। কিন্তু দ্বিতীয় বাইয়াতে এর সাথে যুক্ত হয়েছিল আত্মরক্ষা ও যুদ্ধের প্রতিশ্রুতি।

হিজরতের পটভূমি

সূরা জুমার এর ১০ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হিজরতের ইঙ্গিত দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, বলুন, হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যারা এ দুনিয়াতে সৎকাজ করে, তাদের জন্যে রয়েছে পুণ্য। আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত। যারা সবরকারী, তারাই তাদের পুরস্কার পায় অগণিত।
(সূরা যুমার, ৩৯:১০)
আকাবার দ্বিতীয় শপথের পরবর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে ইয়াসমিন হিজরত করার অনুমতি দান করেন। এবং তার কিছুদিন পর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হিজরত করার অনুমতি দেন।
মদিনায় হিজরতকারী প্রথম সাহাবী হলেন আবু সালামা রা: এবং প্রথম সাহাবিয়াহ হলেন লায়লা বিনতে আবি হাইসামা রা:। তিনি তার স্বামী আমির ইবনু রাবিয়া রা: এর সাথে হিজরত করেছিলেন।
সাহাবীরা যখন দলে দলে হিজরত করে মক্কা ছেড়ে চলে যেতে শুরু করলেন তখন মুশরিকদের মধ্যে আলোচনা শুরু হলো। তারা চরম রকমের মানসিক যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে গেলেন। তারা বুঝতে পারছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে তাদের শিরকি ধর্ম, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও মিথ্যা প্রতিপত্তি ধ্বংস হতে চলছে।

রসুল ﷺ এর হিজরতের বাধা দেয়ার জন্য তাদের সম্মেলন:-

আকাবার দ্বিতীয় শপথের প্রায় আড়াই মাস পর নবুয়তের চতুর্দশ বছরের সফর মক্কার দারুন নাদওয়াতে তারা এক মহাসম্মেলনের আয়োজন করে। কুরাইশের সব বড় বড়

নেতৃবৃন্দ এত অংশগ্রহণ করে। তাদের সম্মেলনের মূল পরিকল্পনা ছিল কিভাবে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করতে পারে। এই সম্মেলনে আবু জেহেল, জুবায়ের বিন মুতইম, হারিস বিন আমির, শাইবাহ বিন রাবিয়া, আবু সুফিয়ান, আবুল বুখতারি ও অন্যান্য নেতারা ছিল । এমনকি ইবলিশ সম্ভ্রান্ত অভিজাত পোশাক পরে নিজেকে নজোদের শাইখ পরিচয় দিয়ে এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়। শেষ পর্যায়ে এসে আবু জাহল বলল, "আমার কাছে এমন এক প্রস্তাব আছে যার সাথে তোমরা একমত না হয়ে পারবে না"। সবাই জিজ্ঞেস করলো, "সেটা কী?" তখন আবু জাহল বলল, "আমার প্রস্তাব হলো প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে সুঠামদেহী যুবক নির্বাচন করা হোক এবং প্রত্যেককে একটি করে ধারালো তরবারি দেওয়া হোক। তারপর সকলেই তার দিকে অগ্রসর হোক এবং সকলে একসাথে তলোয়ার মেরে তাকে হত্যা করুক। তাহলেই আমরা তার হাত থেকে নিস্তার পেয়ে যাব। আর এভাবে হত্যা করার কারণে, রক্তপাতের দায়িত্বটা সকল গোত্রের মাঝে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়বে। এর ফলে বনু আবদে মানাফ একা আরবের সকলের সাথে যুদ্ধ করতে সক্ষম হবে না। তারা কেবল রক্তপণ নিয়েই রাজি হয়ে যাবে এবং আমরা তা আদায় করে দেব"।
তার এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

রসুল ﷺ এর হিজরত :-

এদিকে আল্লাহ তাআলা নবীজিকে কাফেরদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানিয়ে দেন এবং হিজরতের আদেশ দেন। যে রাতে মক্কার কাফেররা হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা করেছিল এবং বিভিন্ন গোত্রের যুবকরা নবীজির বাড়ি অবরোধ করেছিল । সে রাতেই নবীজি হিজরতের ইচ্ছা করেন।সেদিন ছিল ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ২০ শে সেপ্টেম্বর এর রাত।নবুয়তের ১৪ তম বছর। তিনি আলী রাঃ কে তাঁর খাটে তাঁর চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকতে বলেন, যাতে কাফেররা বুঝতে না পারে যে তিনি ঘরে নেই। এরপর তিনি বাড়ির বাইরে চলে আসেন। সেখানে কাফেররা অবস্থান করছিল। তিনি সূরা ইয়াসীন পড়তে পড়তে বের হন এবং فَأَغْشَيْنَٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

আমি তাদের দৃষ্টির ওপর আবরণ রেখেছি,ফলে তারা দেখতে পায় না। এ আয়াতটি কয়েকবার পাঠ করেন। তখন আল্লাহ কাফেরদের চোখে আবরণ সৃষ্টি করে দেন, ফলে তারা নবীজিকে

দেখতে পায়নি। তিনি আবু বকর রা.-এর বাড়িতে যান। আবু বকর রা. আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন এবং নিজেদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য একজন পথপ্রদর্শক ঠিক করে রেখেছিলেন।নবীজি সাঃ আবু বকর রাঃ কে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির পেছনের পথ দিয়ে বেরিয়ে আসেন এবং মক্কার নিকটবর্তী সাওর পর্বতে আত্মগোপন করেন।

সাওর পর্বতের গুহায় :-

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকরকে নিয়ে গুহায় আশ্রয় নেন। এই পর্বতটি ছিল অত্যন্ত খাড়া এবং সেখানে ছিল প্রচুর ধারালো পাথর। গুহার মুখের নিকট পৌঁছে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আগে প্রবেশ করেন এবং গুহার সমস্ত ছিদ্র বন্ধ করে দেন। তারপর তিনি মহানবীকে নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেন। রাসূল ﷺ ভেতরে ঢুকে ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থায় আবু বকরের উরুতে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন। গর্তের ভেতর থেকে সাপ অথবা বিচ্ছু আবু বকরকে দংশন করল। তিনি তীব্র বিষের যন্ত্রণায়ও কাতরালেন না, নড়াচড়া করলেন না বা কোন শব্দ করলেন না- যেন রাসূল এর ঘুম ভেঙে না যায়। চরম যন্ত্রণায় তার চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল এবং সেই অশ্রু গিয়ে পড়ল রাসূল এর মুখের উপর। রাসূল এর ঘুম ভেঙে গেলে, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আবু বকর, তোমার কী হয়েছে?" আবু বকর বললেন, "আমার পিতা মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, গর্তের ছিদ্রপথে কোন কিছু আমার পায়ে কামড় দিয়েছে"। একথা শুনে রাসূল নিজের মুখ থেকে কিছু লালা নিয়ে সেই ক্ষত স্থানে লাগিয়ে দিলেন ফলে আবু বকরের ব্যথা দূর হয়ে গেল। এই পর্বতের গুহায় তারা পরপর তিনরাত্রি অর্থাৎ শুক্র, শনি ও রবিবার রাত্রি অবস্থান করলেন। সাওর পর্বতে থাকাকালীন সময়ে আব্দুল্লাহ বিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের সাথে রাত্রি যাপন করতেন। তিনি দিনের বেলায় মক্কায় কুরাইশদের আশেপাশে

থাকতেন এবং খবর সংগ্রহ করতেন। আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খাবার নিয়ে যেতেন। এছাড়াও আবুবকরের মুক্ত ক্রীতদাস আমের বিন ফুহাইরা সারাদিনই পর্বতের ময়দানে ছাগল চড়াত। কুরাইশরা পাগলের মত তাদের খুঁজতে লাগলো। এমনকি তারা খুঁজতে খুঁজতে এক পর্যায়ে সাউল পর্বতের গুহার প্রবেশ পথের সামনে পৌঁছে গেল। আল্লাহ সুবহানাতায়ালা তাদেরকে রক্ষা করেন।

মদীনার পথে যাত্রা

সাওর পর্বতে তিন দিন অবস্থানের পর প্রথম হিজরির ৪ রবিউল আউয়াল বুধবার আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর আজাদকৃত গোলাম আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু দুইটি উটনী নিয়ে আসেন। তার সাথে আসে আব্দুল্লাহ বিন উরাইকিত যাকে পথপ্রদর্শক হিসেবে পারিশ্রমিক দিয়ে সফরে নেওয়া হয়।

সুরাকার ঘটনা:-

নবীজি যখন ছোট্ট কাফেলা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন আবু জেহেলের ১০০ উট পুরস্কারের লোভে সুরাকা বিন মালেক চারদিকে নবীজিকে খোঁজা শুরু করলেন। একপর্যায়ে সে নবীজির কাফেলা দেখতে পেয়ে তাদের দিকে এগিয়ে গেল এবং কাছাকাছি আসার পর তার ঘোড়া হোঁচট খেলো,সে মাটিতে ছিটকে পড়ে গেল। পুনরায় সে ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে যায় সে নবীজির একদম কাছে চলে আসে সে নবীজির তিলাওয়াত শুনতে পাচ্ছিল। আবু বকর রা:বারবার পিছন দিকে ফিরে তাকে দেখছিলেন। নবীজি তার দিকে ভ্রুক্ষেপও করেননি। কাছাকাছি আসার পর শক্ত সুরাকার ঘোড়ার পা পর্যন্ত দেবে গেল। সুরাকা মাটিতে পড়ে গেল এবং অনেক চেষ্টা করতে লাগলো তার ঘোড়াকে তুলতে। শেষে অপারগ হয়ে নবীজির কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করল, নবীজি থেমে গেলেন সাথে সাথে তার ঘোড়ার পা মাটি থেকে বের হয়ে এলো। এবং নবীজি তাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেয় কিন্তু সে গ্রহণ করে না। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা করে নবীজির সংবাদ কাউকে বলবেনা। এই যাত্রা তেই নবীজি উম্মে মাবাদের বাড়িতে যান। পরবর্তীতে তারা দুজন বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা হিজরত করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন।

কুবায় অবস্থান :-

সেখান থেকে নবীজি মদিনার নিকটবর্তী গ্রাম কুবায় পৌঁছে যান। ৮ এ রবিউল আউয়াল নবুয়তের চতুর্দশ বছরে তিনি কুবায় পৌঁছান। আনসাররা যখন থেকে নবীজী হিজরতের সংবাদ পেয়েছেন আগমনের অপেক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর যখন মুসলমানরা ঘরে ফিরে এলেন তখন এক ইহুদী তাকে দেখতে পান। এবং সে উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠে ওগো কায়লার সন্তানেরা, তোমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে। তোমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত অতিথি ওই যে এসে গেছেন। মুসলিমগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগমনে খুশি হয়ে তাকবীর দিতে দিতে একত্রিত হচ্ছিলেন। এই সময় রসূলের উপর অবতীর্ণ হচ্ছিল সূরা তাহরীমের ৪ নাম্বার আয়াত।

আলী রা: এর হিজরত :-

রসুল ﷺ এর সকল আমানত কাফেরদের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আলী রা: হিজরত করেন। কুবায় এসে তিনি নবীজির সাথে মিলিত হন। সেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারদিন অবস্থান করেন। এবং সেখানে তিনি একটি মসজিদের ভিত্তি প্রস্থ স্থাপন করলেন। সাহাবীদের নিয়ে সালাত আদায় করলেন। নবুয়তের পর এটাই মুসলমানদের স্থাপিত সর্বপ্রথম মসজিদ। যা তাকওয়ার উপরে নির্মিত।

মদীনার দিকে রওনা দেন :-

এরপর তিনি শুক্রবারে আল্লাহর নির্দেশে যাত্রা শুরু করেন। তিনি আগে থেকেই তার নানার বংশের গোত্র বনু নাজ্জার কে সংবাদ প্রেরণ করেছিলেন। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে গ্রহণ করার জন্য কুবায় উপস্থিত হন। এরপর তিনি বাতনে ওয়াদি নামক স্থানে পৌঁছালে জুমার সালাতের সময় হয়ে যায় এবং রসূল ﷺ সেখানে জুমা আদায় করেন।

জুমার সলাত শেষ করে রসুল ﷺ মদীনায় প্রবেশ করেন। ঐদিন থেকেই ইয়াসরিবকে মদিনা তুর রসূল অথবা রসূলের শহর বলা হয়। মদিনার জন্য ওই দিনটি ছিল ঐতিহাসিক দিন।

আনসারগন সকলের আশা ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বাড়িতে অবস্থান করবেন। তারা প্রত্যেকে অস্থির হয়ে গেলেন। কিন্তু নবীজি তাদের বললেন উটের পথ ছেড়ে দাও। সে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত রয়েছে। ফলে উট চলতে লাগলো এবং যেখানে বর্তমানে মসজিদে নববী রয়েছে সেখানে এসে বসে পড়ল। কিন্তু তিনি নিচে নামলেন না। উট পুনরায় উঠে দাঁড়ালো এবং কিছুদূর ঘোরাফেরা করে পুনরায় আগের জায়গায় এসে বসে পড়ল। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেমে পড়লেন। এটাই ছিল তার নানার গোত্রের এলাকা। তিনি আবু আইয়ুব আনসারীর বাড়িতে প্রবেশ করেন। যতদিন পর্যন্ত মসজিদে নববী ও আপন হুজরা নির্মাণ কাজ চলে ততদিন সেই বাড়িতেই ছিলেন। রাসূল ﷺ এর মদিনায় আগমনের কিছুদিন পর রাসূল যায়েদ বিন হারিসা ও তাঁর গোলাম আবু রাফি'কে দুটি উট ও ৫০০ দিরহাম দিয়ে মক্কায় পাঠান যেন তাঁরা ফাতিমা, উম্মে কুলসুম, সাওদা, উসামা বিন যায়েদ ও উম্মে আয়মান কে মদিনায় নিয়ে যেতে পারেন। এর কিছুদিন পর আবু বকর এর ছেলে আব্দুল্লাহ বিন আবু বকর রাঃ আয়েশা রাঃ ও আসমা রাঃ কে সাথে নিয়ে মদিনায় এসেছিলেন। রাসূলের কন্যা যায়নাব রাঃ মক্কায় তার স্বামী আবুল আসের নিকট থেকে গিয়েছিলেন। বদর যুদ্ধের পর তিনি মদিনায় আসেন।

মসজিদে নববী নির্মাণ

মদিনায় রাসূল এর উট যেখানে বসে পড়েছিল সে জায়গাটি ছিল দুজন ইয়াতিম বালকের। তাদের নাম ছিল সাহল ও সুহাইল। জায়গাটি ছিল খেজুর শুকানোর স্থান। বালক দুটির অভিভাবক ছিল তাদের চাচা (একটি বর্ণনা অনুযায়ী তাদের অভিভাবক ছিলেন আস'আদ বিন যুরারাহ)। রাসূল তাকে ডেকে পাঠালেন এবং তার সাথে তিনি জমির মূল্য নিয়ে কথাবার্তা বললেন। বালক দুজন কোন বিনিময় ছাড়াই জমিটি রাসূল কে দিয়ে দিতে চাইলেন, কিন্তু রাসূল তাদের এই আবেদন গ্রহণ করলেন না বরং ১০ দিরহাম মূল্য নির্ধারণ করে সেই জমিটি কিনে নিলেন। এই জমির মূল্য পরিশোধ

করেছিলেন আবু বকর। জায়গাটিতে কিছু খেজুর গাছ ছিল এবং মুশরিকদের কবর ছিল। রাসূল গাছগুলো কেটে ফেলতে বললেন এবং মুশরিকদের কবরগুলো সমান করে দিতে বললেন। এরপর মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যে কাঁচা ইট তৈরি করার নির্দেশ দিলেন।সকল আনসার ও মুহাজির সাহাবি এবং রাসূল নিজেও এই কাজে অংশ নিলেন। সাহাবিদের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করার সময় রাসূল বলছিলেন-

"এটা খাইবরের খেজুরের বোঝা নয়, হে আল্লাহ! এ বোঝা সবচেয়ে উত্তম।"মসজিদ নির্মাণ শেষ হলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রীদের জন্য কামরা নির্মাণ করেন। একটি সাওদা বিনতে জাময়া রাঃ ও আরেকটি আয়েশা রাঃ এর জন্য। মসজিদের পাশেই ছিল হারেসা ইবনে নোমান এর বাড়ি। যখন উম্মুল মুমিনিন দের জন্য নতুন ঘর তৈরি প্রয়োজন হতো তখন তিনি রাসুলের জন্য ঘরের জায়গা দিয়ে দিতেন। তাদের ঘরগুলো চুন ও বালির কাঁদা এবং কাঁচা ইট পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। খেজুর গাছের ডাল পাতা দিয়ে ছাদ নির্মাণ করা হয়েছিল। কামরা গুরুর দরজায় পর্দা হিসেবে থাকতো চটের টুকরা অথবা কম্বল। অধিকাংশ রাতেই কামড়াগুলিতে কোন বাতি জ্বলতো না।

মসজিদে নববীর এক পাশে আহলুস সুফফাদের ছাউনি নির্মাণ করেন। এখানে যেসব সাহাবীরা থাকতেন তাদেরকে বলা হতো আসহাবুস সুফফা। তারা ছিলেন ইসলামের অতিথি তাদের কোন স্থায়ী সম্পদ কিংবা পরিবার পরিজন ছিল না। তারা সর্বক্ষণ সেখানে অবস্থান করতেন এবং রাসূলের কাছ থেকে সার্বক্ষণিক দিন শিক্ষায় নিয়োজিত ছিলেন।

মদিনা সনদ রচনাঃ-

মদিনায় সে সময় ছিল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বসবাস। মুসলিম ছাড়াও ইহুদিদের তিনটি গোত্র এবং সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বেদুঈন মুশরিকদের আনাগোনাও ছিল। এমন একটি সমাজে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, আনুগত্য, পারস্পরিক বিবাদ ও শৃঙ্খলা রক্ষার নিমিত্তে রাসূল

প্রথমেই সর্বসম্মতিক্রমে একটি সংবিধান প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ইতিহাসে এই সংবিধান 'মদিনা সনদ' নামে খ্যাত।

মুজাহিদ বাহিনী গঠন :-

মদিনায় পৌঁছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুজাহিদ বাহিনী গড়ে তুলেন। এখানে কেউই পেশাদার সৈনিক ছিলেন না তারা ছিলেন সাধারণ নাগরিক। তারা ছিলেন সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেসামরিক নাগরিক। জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রত্যেক নাগরিককে চারটি শর্ত পূরণ করতে হতো। তাদের অবশ্যই মুসলমান হতে হবে, তাদেরকে প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে,শারীরিক এবং মানসিকভাবে সুস্থ হতে হবে কারণ তখন রাষ্ট্রের খরচ বহন করার মত অবস্থা ছিল না। সাহাবীরা শারীরিকভাবে শক্ত সামর্থ্য ছিলেন। অনেক কঠিন কঠিন কাজ করে অভিজ্ঞ ছিলেন। তবুও কিছু দক্ষতা প্রয়োজন ছিল। যা তাদেরকে শিখার নির্দেশ দেন। সাঁতার থেকে শুরু করে তীর চালনা লক্ষ্যভেদ ইত্যাদি নানা রকম খেলার সাথে তিনি তাদের সখ্যতা গড়ে তুলেন।

জিহাদ ফরজ হওয়ার ধাপসমূহঃ-

জিহাদ ফরজ হয়েছে চারটি ধাপে-

প্রথম ধাপে যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল। এটি হলো মক্কায় রাসূল এর জীবনের সেই সময়ে যখন রাসূল কে ধৈর্যধারণ করতে বলা হয়েছিল।

দ্বিতীয় ধাপে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে কিন্তু যুদ্ধ ওয়াজিব করা হয়নি। আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করে এই বিধান দেন-

যুদ্ধে অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যাদের সাথে কাফিররা যুদ্ধ করে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম।

(সূরা হাজ্জ, ২২:৩৯)

তৃতীয় ধাপে যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শুধু তাদের সাথেই যুদ্ধ করাকে ওয়াজিব করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন- আর লড়াই কর আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সাথে,

যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারও প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

(সূরা বাক্বারাহ, ২:১৯০)

চতুর্থ ধাপে সব কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে ফরজ করে দেওয়া হয়েছে এই আয়াতের মাধ্যমে-আল্লাহ বলেন,

নিশ্চয় আল্লাহর বিধান ও গননায় মাস বারটি, আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে। তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান; সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো না। আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকীনদের সাথে রয়েছেন।

(সূরা তাওবাহ, ৯:৩৬)

মুসলিম বাহিনীর অবস্থা বিবেচনা করেই যুদ্ধের বিধান ধাপে ধাপে দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধে প্রস্তুতির জন্য সময় প্রয়োজন ছিল প্রয়োজন ছিল একটি শক্ত ইসলামী রাষ্ট্রের।শত্রুর ভয়, চারপাশে থেকে নবিজির উপর নানান হামলা আসার আশংকা সমস্ত কিছু নিয়ে এক বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরী হয় মদীনাতে। এই প্রতিকুলতা ও বিপত্তি গুলো থেকে উদ্ধার পাওয়া মুসলমান দের জন্য একটা অন্যতম চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়ায়।এমন অবস্থায় আল্লাহ রব্বুল আল আমিন মুসলমানদের যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করেন। যুদ্ধের অনুমতি পাওয়ার পর মুসলমান দের সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। প্রহরী হিসেবে মুসলিম সেনাবাহিনী মদীনা ও তার সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তা এর জন্য কাজ করা শুরু করে।

গাজওয়া এবং সারিয়ার পার্থক্যঃ-

গাজওয়াঃ- রসুল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নেতৃত্বে মুসলিম সেনাবাহীনির অভিযান গুলোকে গাজওয়া বলে। নবীজির অংশগ্রহনে যে যুদ্ধগুলা হয়েছে তাই গাজওয়া। সেনাবাহিনী কম বা বেশি সেটা বিষয় না এবং যুদ্ধ হওয়া বা না হওয়াও এখানে প্রভাব ফেলে না।

সারিয়াঃ- যে সব সৈন্যদলকে সাহাবীদের নেতৃত্বে পাঠানো হতো তাদের সারিয়া বলা হতো।যা রাসুল পাঠাতেন কিন্তু নিজে অংশগ্রহন করতেন না। এক্ষেত্রে ও যুদ্ধ না হওয়া বা না হওয়া,কিংবা শত্রুর কম বেশি হওয়া এতে প্রভাব ফেলেনা। বেশির ভাগ সময় সারিয়া তে সৈন্য সংখ্যা কম হতো। মুলত নিজেদের নিরাপত্তা বা শত্রুদের বিভ্রান্ত করাই উদ্দেশ্য ছিল। এবং এতে নিয়মতান্ত্রিক যুদ্ধ হতোনা।

গাজওয়া সারিয়া এর সংখ্যা :-

রসুল ﷺ এর হিজরতের পর থেকে যতগুলো গাযওয়া ও সারিয়া সংঘটিত হয় তা নিয়ে বিভিন্ন মত ভেদ আছে। এই মতভেদ এর কারন হলো অনেক সীরাহ এর আলেমন গন সময়ের ব্যাবধান কম হলে একটাই ধরেছেন।

রসুল ﷺ এর হিজরতের পর থেকে যতগুলো গাযওয়া ও সারিয়া সংঘটিত হয় তা নিয়ে বিভিন্ন মত ভেদ আছে। এই মতভেদ এর কারন হলো অনেক সীরাহ এর আলেমন গন সময়ের ব্যাবধান কম হলে একটাই ধরেছেন। মতানুসারে ২৭ টি, ২৪ টি, ২১ টি, ১৯ টি গাজওয়া এর উল্লেখ করেছেন মুসা ইবনে উকবাহ, মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক, ওয়াকেদী, ইবনে সাদ, ইবনে জাওযী, সাইদ ইবনে মুসাইয়াব, জাবির বিন আব্দুল্লাহ, যায়েদ ইবনে আরকাম রাহিমুল্লাহ। সারিয়া এর ক্ষেত্রেও ইবনে সাদ এর মতে ৪০ টি, ইবনে আব্দুল বার এর মতে ৩৫ টি, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক এর মতে ৩৮ টি, ওয়াকেদী এর মত ৪৮ টি এবং ইবনে জাওযী এর মতে ৫৬টি।

বদর যুদ্ধের পূর্ববর্তী সারিয়া এবং গাজওয়া সমূহ :-

গাজওয়াতুল আবওয়া ও গাজওয়াতুল ওয়াদ্দানঃ-

রসুল ﷺ কর্তৃক পরিচালিত প্রথম গাজওয়া ছিল গাজওয়াতুল আবওয়া বা গাজওয়াতুল ওয়াদ্দান।মুসলমান সাহাবীদের প্রথম যুদ্ধ রসুলকে সাথে নিয়ে।আবওয়া ও ওয়াদ্দান পাশাপাশি দুইটি এলাকা। এই গাজওয়াটি হয় দ্বিতীয় হিজরির সফর মাসে।মুসলিম

সেনা ছিল প্রায় ২০০ জন। এই সফরে কোন যুদ্ধ হয়নি বরং কিনানা গোত্রের বনু যামারার সাথে সন্ধি হয়। ১৫ দিন পর রসুল ﷺ মদীনায় ফিরে আসেন।

সারিয়া উবায়দা ইবনুল হারিস বা সারিয়াতু রাবিগ :-

ইসলামী পতাকার নেতৃত্বে এটাই মুসলিমদের প্রথম সারিয়া। ১ম হিজরির শাওয়াল মাসে এই সারিয়া রসুল ﷺ পাঠান, যাতে সৈন্য সংখ্যা ছিল ৭০ জনের মতো,অন্যান্য মত অনুযায়ী ৬০/৮০ মুহাজির সাহাবি ছিলেন। রসুল ﷺ উবাইদাহ ইবনু হারিস ইবনু মুত্তালিব কে এই বাহিনী এর নেতা হিসেবে নির্বাচন করেন। এ অভিযানে তারা রাবিগ উপত্যকায় মুশরিকদের সম্মুখীন হয়। যেখানে আবু সুফিয়ান এর নেতৃত্বে প্রায় ২০০ জন মুশরিক ছিল। সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস শত্রুদের দিকে প্রথমবার মুসলিমদের হয়ে তীর নিক্ষেপ করেন। যুদ্ধটি খুব বেশী দীর্ঘস্থায়ী ছিল না। মক্কা থেকে মিকদাদ বিন আমর ও উতবাহ বিন গাযওয়ান কাফিরদের সাথে আসে মদীনার মুসলমানদের সাথে যোগ দিতে,যারা আগে থেকেই মুসলমান ছিল।

সারিয়া হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব বা সারিয়াতুল সীফিল বাহর:-

আবু ইসহাক এর বর্ননা মতে, রসুল ﷺ আবওয়া থেকে মদীনায় ফিরে হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব কে সেনাপতি নিযুক্ত করে ঈস এর সমুদ্র উপকুলে প্রায় ত্রিশ জন মুহাজির সাহাবী পাঠান। এই সারিয়াতে শুধু মুহাজির ছিল। সেই অঞ্চলে তারা আবু জেহেল এর মুখোমুখি হয় এবং আবু জেহেল এর সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০০ জন। কিন্তু জুহায়না গোত্রের নেতা মাজদী ইবনে আমর বাধা দেন এবং উভয় পক্ষেরে মিত্র হয়ে তাদের দুই দলকে শান্ত করেন। হামযা রা এর এটা ছিল প্রথম পতাকা যা রসুল ﷺ নিজ হাত দিয়ে বেধে দিয়েছিল।

গাজওয়াতুল বুওয়াতঃ-

দ্বিতীয় হিজরি রবিউল আওয়াল মাসে রসুল ﷺ ২০০ জন সাহাবীর দল নিয়ে বের হন। উমাইয়া ইবনে খালাফ ও কুরাইশ কাফেলার পথ রোধ করাই উদ্দেশ্য ছিল। মুসলমান বাহিনী রাযওয়ার পার্শ্ববর্তী বুওয়াত নামক স্থানে পৌছান। তাদের দেখা পান না তাই আবার ফিরে আসেন।

গাজওয়াতুল উশাইরাঃ-

রসুল ﷺ মদীনাতে আবু সালমা ইবনু আব্দিল আসাদ কে শাসনভার দিয়ে কুরাইশদের ধরার জন্য উশাইরার উদ্দেশ্য বের হোন। সেখানে তিনি ২য় হিজরির জুমাদুল উলার পুরো মাস ও জুমাদাল উখরার কিছুদিন অবস্থান করেন। এ সময় তিনি বনু মুদলিজ এবং তাদের মিত্র বনু যামরার সাথে চুক্তি করেন। তারপর মদীনায় ফিরে আসেন। কারন সম্পদবাহী যেই কাফেলাকে উদ্দেশ্য করে নবী ﷺ গিয়েছিলেন তারা আগেই শাম এর দিকে চলে যায়।

গাজওয়ায়ে সাফওয়ানঃ- এই গাযওয়াটি সংঘটিত হয় ২য় হিজরির রবিউল আওয়াল মাসে। এর কারন ছিল কুরয ইবনে জাবের ফিহরী মদীনার চরনভুমিতে আক্রমন করে কিছু উট ও বকরী নিয়ে যায়। রসুল ﷺ তার খোজে বের হয়ে বদরের পাশে সাফওয়ান উপত্যকা পর্যন্ত যান। কিন্তু তাকে ধরতে না পেরে মদীনায় ফিরে আসেন। এই অভিযান এ সেনা ছিল প্রায় ৭০ জন। পরবর্তীতে কুরয ইবনে যাবের ইসলাম গ্রহন করেন।

সারিয়া সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস বা সারিয়্যায়ে খাররার:-

রসুল ﷺ ১ ম হিজরি এর যুল কাদাহ মাসে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ও সাথে ৮ জন সৈন্য দিয়ে কুরাইশ কাফেলার গতিবিধি লক্ষ্য রাখার জন্য পাঠান। তিনি হিজাযের খাররার নামক জায়গা পর্যন্ত যান। এই যাত্রায় তারা এত বেশি গোপনীয়তা বজায় রাখতেন যে দিন এর বেলা লুকিয়ে থাকতেন রাতের বেলা হাটতেন। কিন্তু সেখানে

গিয়ে তারা জানতে পারেন এক দিন আগেই কাফেলা চলে গিয়েছে। তারা ফিরে আসেন।

বদরের প্রথম গাজওয়া অথবা গাজওয়ায়ে সাফওয়ান:

২য় হিজরির রবিউল আওয়াল মাসে কুরয ইবনে জাবের ফিহরী মদিনার চারণভূমিতে আক্রমণ করে কিছু উট ও বকরি নিয়ে যায়। রাসূল তার খোঁজে বের হয়ে বদরের পার্শ্ববর্তী সাফওয়ান উপত্যকা পর্যন্ত যান। কিন্তু কুরয ইবনে জাবের পালিয়ে যায়। রাসূল তাকে ধরতে না পেরে মদিনায় ফিরে আসেন। এই অভিযানে মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল ৭০ জন।

কুরয ইবনে জাবের পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। উরাইনা গোত্রের বিরুদ্ধে রাসূল যখন ২০ জন সৈন্যের বাহিনী প্রেরণ করেন তখন এর নেতৃত্বের দায়িত্বে ছিলেন কুরয ইবনে জাবের। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

সারিয়ায়ে নাখলা বা সারিয়ায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ :-

২য় হিজরি এর রজব মাসের শেষ এর দিকে কুরাইশদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ এর জন্য আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ আসাদী এর নেতৃত্বে ৮ জন মুহাজিরকে মতান্তরে **১২** জন এর বাহিনী কে রসুল ﷺ প্রেরন করেন। উনাকে নির্দেশনা দেয়া হয় দুই দিন এর পথ অতিক্রম করার পরে যেন রসুল ﷺ কর্তৃক প্রেরিত চিঠি পাঠ করেন। যাতে লেখা ছিল আমার এই পত্র পাঠ করার পর তোমরা সামনের দিকে এগিয়ে চলবে এবং মক্কা ও তায়িফের মধ্যবর্তী নাখলায় অবতরন করবে। এক কুরাইশ কাফেলার আগমনের প্রতীক্ষায় তোমরা সেখানে ওত পেতে থাকবে এবং তাদের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে আমাদের অবহিত করবে।

তার সেনাদের নিয়ে তিনি দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে নাখলায় পৌছান। সেখানে কুরাইশদের এক বণিক দল যাচ্ছিল যাতে অনেক মূল্যবান সম্পদ ছিল। যেই কাফেলায় ছিল ইবনে

মুগীরার দুই ছেলে উসমান ও নওফাল এবং আমর ইবনু হাযরামী ও হাকাম ইবনু কায়সান। এবং সেই দিন ছিল রযবের শেষ দিন। এবং তারা শুধু মাত্র খবর আনার লক্ষ্য সেখানে গেলেও তারা আক্রমণ করে বসে। এবং মুসলমানদের ছোড়া তীর এ আমর ইবনু হাযরামি মারা যায়। এবং উসমান এবং হাকাম কে বন্দী করে সমস্ত সম্পদ নিয়ে তারা মদীনায় ফিরে আসে। রসুল ﷺ দরবার এ এই গনিমত নিয়ে আসার পর উনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এই গনিমত ও যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকেন। এবং মুশরিকরা এই সুযোগ কাজে লাগায়। তারা বলে মুসলমানরা অপরাধী কারন তারা হারাম মাস এ যুদ্ধ ও হত্যা করেছে। তখন আল্লাহ রব্বুল আল আমিন সুরা বাকারার ২১৭ নং আয়াত নাযিল করেন। এবং রসুল ﷺ বন্দীদের ছেড়ে দেন ও নিহত ব্যাক্তির জন্য রক্তপণ দেয়ার ব্যাবস্থা করেন। উসমান মক্কায় ফিরে গেলেও হাকাম ইসলাম গ্রহন করে এবং মদীনায় থেকে যান।

কেবলা পরিবর্তন :-

দ্বিতীয় হিজরিতে এই স্মরণীয় ঘটনা ঘটে। নবীজির আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী বাইতুল মুকাদ্দাস এর পরিবর্তে বায়তুল্লাহকে কেবলা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। আল্লাহর ইবাদতের জন্য কেন্দ্র হিসেবে নির্ধারণ করা হয় কাবাঘরকে।

কুরাইশ কাফেলার সংবাদ :-

রসুল ﷺ খবর পেলেন শ্যাম থেকে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে ফুরাইসের একটি বড় বাণিজ্য কাফেলা আসছে।সেই কাফেলা তে আছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা সমপরিমাণ সম্পদ, ১০০০ উট কিন্তু এর পাহারায় আছে মাত্র ৩০থেকে ৪০ জন ব্যক্তি। রসূল ﷺ তখন সাহাবীদেরকে ডেকে বললেন, আমাদের একটি অভিযানে যেতে হবে। যার যার উট প্রস্তুত আছে সে যেন রওনা দেয়। গোপনীয়তার স্বার্থে উটের গলা থেকে

ঘন্টা খুলে নেয়া হয়। দ্বিতীয় হিজরীর ১২ই রমজান তিনি সাহাবীদের কে নিয়ে মদিনা থেকে বের হন।

বদর যুদ্ধে মুসলিমদের সৈন্য সংখ্যা :-

বদর যুদ্ধে মুসলিমদের সৈন্য সংখ্যা নিয়ে মতবিরোধ আছে। ইমাম বুখারী রাহিমুল্লাহ বলেছেন ৩১০ এর মত সৈন্য সংখ্যা ছিল।ইমাম মুসলিম রাহিমুল্লাহ বলেছেন সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় ৩১৯ জন। তারা কেবল কাফেলা কে আক্রমণের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন।আউস গোত্রের ছিল ৬১ জন, হাজরাজের ১৭০ জন এবং বাকিরা ছিল মুহাজির।

আবু সুফিয়ানের কাফেলা নিরাপদ ও কুরাইশদের ষড়যন্ত্র :-

ওদিকে আবু সুফিয়ান তার কাফেলার ওপর আক্রমণের জন্য মুসলিম বাহিনীর মদিনা থেকে রওনা দেওয়ার খবর পেলেন। শাম থেকে ফেরার পথে আবু সুফিয়ান খুব সতর্কতার সাথে মুসলিমদের গতিবিধি সম্পর্কে খোঁজ রাখছিলেন। কোন কোন বর্ণনামতে, শাম যাওয়ার সময় পেছন থেকে মুসলিমদের আক্রমণের (গাযয়াতুল উশাইরা) সংবাদ তিনি পেয়েছিলেন এবং তাই ফিরতি পথে মুসলিমদের আক্রমণের ব্যাপারে অত্যাধিক সচেতন ছিলেন। চারিদিকে গোয়েন্দা ছড়িয়ে দেওয়া ছাড়াও তিনি নিজেও সে অঞ্চলের স্থানীয় অধিবাসীদের মুসলিমদের ব্যাপারে প্রশ্ন করছিলেন। বদর এলাকায় পৌঁছে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমরা কি তোমাদের এলাকায় অচেনা কাউকে দেখেছ?” তারা বলল, "দুজন ব্যক্তিকে দেখেছি।” আবু সুফিয়ান বলল, "আমাকে তাদের বাহনের কাছে নিয়ে যাও”। আবু সুফিয়ান সেখানে গিয়ে তাদের উটের মল হাতে নিয়ে দেখলেন ভেতরে খেজুরের বিচি। তিনি সেই বিচি পর্যবেক্ষণ করে বললেন, “আল্লাহর কসম, এ তো ইয়াসরিবের উট!” সাথে সাথে তিনি তাদের সম্পদ ও কাফেলা রক্ষার জন্য এগিয়ে আসতে আহ্বান জানিয়ে যমযম ইবনে আমর

গিফারীকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মক্কায় পাঠালেন এবং তার (আবু সুফিয়ান) কাফেলার ফেরার সাধারণ পথ পালটে সমুদ্র উপকূলবর্তী পথ ধরে মক্কার দিকে এগিয়ে গেলেন। যমযম ইবনু আমর কুরাইশদের উত্তেজিত করতে ও পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝাতে উটের নাক কেটে, হাওদা উল্টিয়ে ও নিজের গায়ের জামা দুই দিক থেকে ছিড়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিল। চিৎকার করে সে বলছিল, "তোমাদের কাফেলা, তোমাদের কাফেলা! আবু সুফিয়ানের সাথে থাকা তোমাদের সম্পদের উপর মুসলিমরা হামলা করেছে। হয়তো তোমরা তোমাদের সম্পদ হারাতে যাচ্ছ। সাহায্য করো, সাহায্য করো।"কাফেলা বিপদে পড়ার খবর শুনে কুরায়েশ নেতারা ক্রোধে ফুঁসে উঠলো। এটি ছিল তাদের ঔদ্ধত্য এবং অহমিকার উপরে যেমন আঘাত তেমনি তাদের অর্থনীতির জন্য হুমকিস্বরূপ। কাফেলা রক্ষা করার জন্য তারা দিশেহারা হয়ে তাদের পূর্ণ সামরিক শক্তি নিয়ে বদর অভিমুখে রওনা দিল। ইবনে ইসহাক এর বর্ণনামতে, কুরাইশ বাহিনীতে ছিল ১০০ এর বেশী ঘোড়া, ৬০০ বর্ম পরিহিত সৈন্য ও ৫০০ এর বেশী উট। ওদিকে আবু সুফিয়ান বিপজ্জনক এলাকা অতিক্রম করে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে কুরাইশ নেতাদের কাছে খবর পাঠাল যে- 'কাফেলা রক্ষা পেয়েছে, আপনারা মক্কায় ফিরে যান'। কিন্তু এর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। তাদের অধিকাংশই মুসলিমদের সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে অবস্থান নিল। তাদের যুক্তি ছিল, মুসলিমদের উপর আক্রমন করলেই কুরাইশদের ব্যবসার পথ ভবিষ্যতের জন্য নিরাপদ হবে এবং অন্য গোত্রগুলোর ওপর এর প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হবে। যুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে কুরাইশদের প্রধান নেতৃবৃন্দ সকলেই একমত হল ও রওনা দেওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করল।

নবীজি ﷺ এর সাহাবীদের সাথে মাশোয়ারা :-

নবীজি সাঃ যখন জানতে পারলেন আবু সুফিয়ান নাগালের বাইরে চলে গেছে এবং মক্কার নেতারা যুদ্ধের জন্য এগিয়ে আসছে তখন তিনি পরামর্শের জন্য সাহাবীদের একত্রিত করলেন। কিছু সাহাবী যুদ্ধের পক্ষে মত দিলেন আর কিছু সাহাবী কুরাইশদের মুখোমুখি হতে ভরসা পাচ্ছিলেন না।এই প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন :-

যেমন করে তোমাকে তোমার পরওয়ারদেগার ঘর থেকে বের করেছেন ন্যায় ও সৎকাজের জন্য, অথচ ঈমানদারদের একটি দল (তাতে) সম্মত ছিল না। তারা তোমার সাথে বিবাদ করছিল সত্য ও ন্যায় বিষয়ে, তা প্রকাশিত হবার পর; তারা যেন মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে দেখতে দেখতে। আর যখন আল্লাহ দু'টি দলের একটির ব্যাপারে তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, সেটি তোমাদের হস্তগত হবে, আর তোমরা কামনা করছিলে যাতে কোনরকম কন্টক নেই, তাই তোমাদের ভাগে আসুক; অথচ আল্লাহ চাইতেন সত্যকে স্বীয় কালামের মাধ্যমে সত্যে পরিণত করতে এবং কাফেরদের মূল কর্তন করে দিতে। যাতে করে সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দেন, যদিও পাপীরা অসন্তুষ্ট হয়। (সূরা আনফাল, ৮:৫-৮)

এরপর রাসূল বললেন, "হে লোকসকল, আমাকে পরামর্শ দাও"। তিনি এখানে আনসারদের মত জানতে চাচ্ছিলেন। কারণ, তাঁরাই ছিলেন সেনাবাহিনীর অধিকাংশ এবং আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াত অনুযায়ী মদিনার বাইরে রাসূল কে রক্ষা করার দায়িত্ব তাদের উপর বর্তায় না। আনসারদের পতাকাবাহী সা'দ বিন মুয়ায কথা শুনতে চাচ্ছেন"। রাসূল নবীজির উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বললেন, "আপনি বোধহয় আমাদের বললেন, "হ্যাঁ"। তখন তিনি বললেন, "আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি, আপনাকে সত্যায়ন করেছি, সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আপনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা সবই সত্য এবং আমরা আপনার আনুগত্যের শপথ করেছি। আপনি আপনার লক্ষ্যে এগিয়ে যান। হে আল্লাহর রাসূল, আপনাকে যিনি সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন সেই রবের শপথ, যদি আপনি আমাদের নিয়ে সমুদ্রেও ঝাঁপিয়ে পড়েন তবে আমরাও আপনার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়বো। আমাদের একজনও পিছিয়ে থাকবে না। আপনি চাইলে আমাদের নিয়ে শত্রুর মুখোমুখি হন, আমরা যুদ্ধে ধৈর্যশীল থাকব। আক্রমণের মুখে আমরা জোয়ানী ও তেজোদীপ্ত পৌরুষের প্রমাণ দিব। যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহ আমাদের পক্ষ থেকে এমন কিছু দেখাবেন যা আপনার চোখ শীতল করবে। সুতরাং আপনি যেখানে ইচ্ছা আমাদের নিয়ে চলুন। আল্লাহ আমাদের কাজকর্মে বরকত দান করুন"। আল্লাহর রাসূল তাঁর কথা শুনে ভীষণ খুশি হলেন। তিনি বললেন, "এগিয়ে যাও এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর।

নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে দু'দলের মধ্য থেকে একটি অঙ্গীকার করেছেন। আল্লাহর কসম! আমি যেন এখনই সেই কওমের বধ্যভূমি দেখতে পাচ্ছি"।

গায়েবি সাহায্য:-

আল্লাহ তাঁর রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করলেন সে রাতেই। মক্কা বাহিনীর উপরে বৃষ্টি বর্ষিত হল মুষলধারার মত। তাদের পায়ের নিচের মাটি কাদায় পরিণত হলো। আর সেই বৃষ্টির পানিতে মুসলিম বাহিনী হয়ে গেল পবিত্র।

মুসলমানদের অংগীকার :-

যুদ্ধাস্ত্রে সুসজ্জিত এক হাজার সৈন্যের মোকাবেলায় সাজ-সরঞ্জামহীন ৩০০ জন মুজাহিদ মুখোমুখি হন। এমন অবস্থায় একজন মানুষও যুদ্ধে শরিক হতে চাইলে কত বড় উপকার হতো! কিন্তু ইসলাম ধর্মে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা এরচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বদর যুদ্ধের ময়দানে হুযাইফা রা. ও আবু হুসাইল রা. যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে এসে তাদের কাহিনি বর্ণনা করেন যে, এখানে আসার পথে কুরাইশরা তাদেরকে আটক করে জানতে চায়, 'তোমরা কি মুহাম্মাদের সাহায্যার্থে যাচ্ছ?' তারা অস্বীকার করেন। তখন কুরাইশরা তাদেরকে যুদ্ধে শরিক না হওয়ার অঙ্গীকার করায়। নবীজি এই অঙ্গীকার সম্পর্কে জানতে পেরে এ দুজনকে যুদ্ধে অংশ নিতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, 'আমরা সর্বাবস্থায় ওয়াদা রক্ষা করব। আল্লাহর সাহায্যই আমাদের জন্য যথেষ্ট।'

দুই পক্ষ সারিবদ্ধভাবে মুখোমুখি হওয়ার পর কুরাইশের তিন বাহাদুর যোদ্ধা এগিয়ে আসে উতবা, শাইবা ও ওয়ালিদ। মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাদের মোকাবেলা করেন আলী রা., হামযা রা. ও উবাইদা বিন হারিস রা.। কাফের তিনজন নিহত হয়, মুসলমানদের শুধু উবাইদা রা. আহত হন। আলী রা. তাকে কাঁধে তুলে নবীজির কাছে নিয়ে আসেন। নবীজি তার মাথা নিজ পায়ের ওপর রেখে তাকে শুইয়ে দেন এবং তার চেহারার ধুলোবালি নিজ হাতে মুছে দেন। উবাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু শেষ নিঃশ্বাস যখন ত্যাগ করেন নবীজি কে জিজ্ঞেস করেন আমি কি শাহাদাতের ফজিলত থেকে

বঞ্চিত হব। আল্লাহর নবীর উত্তর দেন না তুমি শহীদ এ ব্যাপারে আমি সাক্ষী থাকলাম। উবাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুর পর নবীজির স্বয়ং তার কবরে অবতরণ করেন এবং নিজ হাতে তাকে সমাহিত করেন।

সাহাবীদের ত্যাগ :-

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর অনেক আত্মীয় যারা সাহাবীদের তরবারির নাগালে চলে আসে। কিন্তু তারা ঈমানের উপরে এত বেশি দৃঢ় ছিল যে সেখানে আত্মীয়তার সম্পর্ক ও ম্লান হয়ে যায়। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর পুত্র যে তখনও মুসলমান হয়নি ময়দানে এলে স্বয়ং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তরবারি নিয়ে তার দিকে অগ্রসর হন। উদবা সামনে এলে তার পুত্র হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু তরবারি খাপ মুক্ত করে তার দিকে এগিয়ে যান। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার মামাকে রণক্ষেত্রে দেখতে পেয়ে তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হন। তুমুল লড়াই শুরু হয় ময়দানের যুদ্ধ চলছিল আর নবীজি সেজদায় পড়েছিলেন। তিনি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাচ্ছিলেন।

ফেরেশতাদের যুদ্ধ :-

বদর যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা সরাসরি প্রথমে ১০০০, এরপর ৩০০০ এবং সবশেষে ৫০০০ ফেরেশতা নাযিল করে মুসলিম বাহিনীকে সাহায্য করেন। তবে কোন কোন বর্ণনামতে, আল্লাহ শুধু ১০০০ ফেরেশতা নাযিল করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ কুরআনে বলেছেন সূরা আনফালের ১২ নং আয়াতে, সূরা আলে ইমরানের ১২৪ ও ১২৫ নং আয়াতে।

যখন নির্দেশ দান করেন ফেরেশতাদিগকে তোমাদের পরওয়ারদেগার যে, আমি সাথে রয়েছি তোমাদের, সুতরাং তোমরা মুসলমানদের চিত্তসমূহকে ধীরস্থির করে রাখ। আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দেব। কাজেই গর্দানের উপর আঘাত হান এবং তাদেরকে কাটো জোড়ায় জোড়ায়।

(সূরা আনফাল, ৮:১২)

আবু উসাইদ সায়েদী বলেন, "বদর যুদ্ধের দিন ফেরেশতারা গৌর বর্ণের পাগড়ি পরিহিত ছিলেন এবং পাগড়ির শেষ প্রান্ত দুই কাঁধের মাঝে ছেড়ে দেওয়া অবস্থায় ছিল।”

যুবায়ের ইবনুল আওয়াম বদর যুদ্ধের দিন গৌর বর্ণের পাগড়ি পরে যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছিলেন। সকল ফেরেশতারা তাঁর অনুকরণে গৌর বর্ণের পাগড়ি পরে নেমে আসে। নিঃসন্দেহে এটি তাঁর জন্য এক বিরল সম্মান।ইবনে আব্বাস বলেন, বদর যুদ্ধে জনৈক মুসলিম মুজাহিদ একজন মুশরিক সেনার পিছু ধাওয়া করছিলেন। হঠাৎ তিনি সেই মুশরিক সৈনিকের উপর চাবুকের আঘাত শুনতে পেলেন এবং তার পাশাপাশি একজন অশ্বারোহীর কণ্ঠস্বর শুনলেন। তিনি বলছিলেন, "হাইজুম! (ফেরেশতার বাহনের নাম) এগিয়ে যাও”। সাথে সাথে ওই মুশরিক মাটিতে গড়িয়ে পড়ে। তিনি দেখলেন তার নাক-মুখ মন্ডল থেকে রক্ত বের হচ্ছে যেন কেউ তাকে বিষাক্ত চাবুক দিয়ে আঘাত করেছে। ওই আনসারী সাহাবি রাসূল কে ঘটনাটি জানালে রাসূল বললেন, “তুমি ঠিকই বলেছ, তিনি ছিলেন তৃতীয় আকাশ থেকে অবতরণকারী ফেরেশতা।

(সহিহ মুসলিম)

ইবনে আব্বাস থেকে আরেকটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। রাসূল বদর যুদ্ধের দিন বলেছিলেন, "এই হলেন জিবরীল। তিনি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নিজের ঘোড়ার লাগাম টেনে দাঁড়িয়ে আছেন।"

(সহিহ বুখারী)

আলী বর্ণনা করেছেন, আনসারী গোত্রের এক সাহাবি বদর যুদ্ধের দিন আব্বাসকে গ্রেফতার করে আনেন। আব্বাস বলছিলেন, "আল্লাহর শপথ, সে আমাকে গ্রেফতার করেনি। আমাকে অনিন্দ্য সুন্দর চেহারার এক লোক গ্রেপ্তার করেছেন। যার মাথার দিকে কোনো চুল ছিলো না এবং তিনি ছিলেন ধূসর বর্ণের ঘোড়ার আরোহী। আমি উপস্থিত লোকদের মাঝে তাকে দেখছি না"।

অবশেষে বিজয় :-

বদর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর স্পষ্ট বিজয় অর্জন করে। মুশরিকদের ৭০ জন নিহত হয় এবং ৭০ জন বন্দি হয়। আর মুসলিম বাহিনীর ১৪ জন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করে তাদের মধ্যে ছিলেন ৬ জন মুহাজির ও ৮ জন আনসার। যুদ্ধের পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের ২৪ জন সর্দারের লাশ বদরের নোংরা, অপবিত্র ও দুর্গন্ধময় কুয়ায় ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দেন। ৭০ জনের মধ্যে বাকিদের লাশ অন্য কুয়ায় ফেলে দেয়া হয়। তিন দিন অতিক্রান্ত হলে ২০ রমযান রাসূল বদর প্রান্তর থেকে রওনা দিলেন। ফিরে আসার সময় তিনি ২৪ জন সর্দারের লাশ যে কুয়ায় ফেলা হয়েছিল তার নিকটে গিয়ে তাদের প্রত্যেককে 'অমুক ইবনে অমুক' বলে ডাকলেন এবং বললেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা তোমাদের ভালো লাগেনি। আমাদের প্রতি আমাদের রব যে ওয়াদা করেছেন আমরা তা সঠিক ও সত্য হওয়ার নিশ্চিত প্রমাণ পেয়েছি। তোমাদেরকে যে অঙ্গীকার প্রদান করা হয়েছে তা তোমরা সত্য হিসেবে পেয়েছ কি?"

একথা শুনে উমার রা: বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি প্রাণহীন কতগুলো লাশের সাথে কথা বলছেন?" রাসূল বললেন, "ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা আমার কথা তাদের চেয়ে বেশি শুনতে পাও না। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, তারা কথার জবাব দিতে পারে না”। চূড়ান্ত বিজয়ের পর রাসূল আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা জায়েদ বিন হারিসা রা: মদিনাবাসীর নিকট সুসংবাদ প্রদানের জন্য মদিনার উচ্চ এলাকায় কে এবং নিম্ন এলাকায় এবং জায়েদ বিন হারিসা রা: কে পাঠালেন। রাসূল সা: এর উট কাসওয়ার পিঠে চড়ে তাকবীর দিতে দিতে মদিনায় প্রবেশ করলেন। মদিনাবাসী তার চারপাশে জড়ো হলে তিনি কুরাইশদের নিহত নেতাদের নাম বলতে লাগলেন আর মুসলিমরা আনন্দ ও আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করলেন। এই সুযোগে কিছু মুনাফিক রটিয়ে দিল যে, রাসূল নিহত হয়েছেন আর তাই জায়েদ বিন হারিসা রাসূল এর উটে চড়ে মদিনায় এসেছেন।

বদর যুদ্ধের বিজয়ের সংবাদ যেদিন মদিনায় প্রবেশ করে সেদিন আরেকটি বিষাদময় ঘটনা ঘটে। রাসূল সা :এর প্রিয় কন্যা ও উসমান রা: এর স্ত্রী রুকাইয়া ইন্তিকাল করেন। বিজয়ী মুসলিম বাহিনী যখন মদিনায় প্রবেশ করছে তখন মাত্র রুকাইয়া এর দাফন-কাফন সম্পন্ন হয়েছে। তাই রাসূল সা: এর জন্য এই দিন ছিল আনন্দ ও কন্যা হারানোর কস্টের দিন। আল্লাহ যেন মুসলিমদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, এই দুনিয়া চিরস্থায়ী সুখের বা আনন্দের জায়গা নয়।

আবু জাহেল এর মৃত্যু :-

আব্দুর রহমান ইবনে আওফ বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আমি ছিলাম যুদ্ধের সারিতে। আমার ডানে বাঁয়ে দেখলাম দুজন অল্পবয়সি আনসার কিশোর। [তারা দুজন হলো- মুআজ (ভিন্ন বর্ণনায়- মুআওয়িজ) ইবনে আফরা ও মুআয ইবনে আমর ইবনে জামূহ] আমি ভাবলাম, আমার পাশে শক্তিশালী দুজন যোদ্ধা থাকলে খুব ভালো হতো। তাদের একজন আমাকে বলল, “চাচাজান আপনি কি আবু জাহল কে চেনেন?” আমি বললাম, "তোমরা তার কী করবে?” সে বলল, "আমি শুনেছি সে রাসূল - এর ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করে। ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, আমি যদিতাকে দেখতে পাই তবে হয় আমি মারা যাবো অথবা সে মারা যাবে"। আমি তার কথায় আশ্চর্য হলাম। দ্বিতীয়জনও আমাকে একই কথা বলল। তখনই আমি আবু জাহলকে দেখলাম সে লোকজনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমি তাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। তারা সাথে সাথে নিজের তরবারি নিয়ে ছুটলো এবং তাকে আঘাত করে বসল। অতঃপর রাসূল এর কাছে গিয়ে এই খবর জানানো হলে রাসূল বললেন, "তোমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছে?” তারা উভয়ে দাবি করল যে সে-ই তাকে হত্যা করেছে। তখন রাসূল তাদের উভয়ের তরবারি দেখেন এবং বলেন, "তোমর উভয়েই তাকে হত্যা করেছো"। অবশ্য তার নিকট হতে প্রাপ্ত মালামাল মুআয ইবনে আমর ইবনে জামূহকে দেওয়া হলো।মুআয বিন আমর বিন জামূহ বর্ণনা করেছেন, "যখন আমি আবু জাহলকে আঘাত করলাম (এই আঘাতের ফলে তার পা দ্বিখণ্ডিত হয়ে খুলে পড়ে যায়) অন্য দিকে তখন

তার পুত্র ইকরিমা আমার কাঁধে তরবারির আঘাত করল এবং তাতে আমার হাত কেটে গিয়ে চামড়ার সঙ্গে ঝুলে থাকল এবং যুদ্ধের জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। আমি সেটি পিছনে টেনে নিয়ে সাধারণভাবে যুদ্ধ করতে থাকলাম। কিন্তু সে যখন আমাকে খুবই কষ্ট দিতে লাগল তখন আমি তার উপর আমার পা রেখে জোরে টান দিয়ে তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললাম"। রাসূল বললেন, "আবু জাহলের কী অবস্থা তোমরা কি একটু দেখে আসবে?" - একথা শুনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ দেখতে গেলেন। তিনি দেখতে পেলেন, সে মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে আছে। তখন তিনি তার দাড়ি ধরে বললেন, "তুমি কি আবু জাহল?" উত্তরে সে বলল, "সেই লোকটির চেয়ে উত্তম আর কেউ আছে কি যাকে তার গোত্রের লোকেরা হত্যা করলো?" অথবা বলল, "তোমরা যাকে হত্যা করেছ"।

ভিন্ন বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, আমি বদরের দিন আবু জাহলকে আহত অবস্থায় দেখে তাকে বললাম, "হে আল্লাহর শত্রু, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করেছেন। উত্তরে সে বলল, "আমাকে কীভাবে লাঞ্ছিত করেছেন? তোমরা যাকে হত্যা করেছ তার চেয়ে সম্মানিত আর কে আছে?" আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, "আমার কাছে তরবারি ছিল। আমি তাকে হত্যা করতে অগ্রসর হয়ে দেখতে পেলাম তার ধারালো তরবারি তার হাতে মুষ্টিবদ্ধ। আমি তার হাতে আক্রমণ করলে তার হাত থেকে তা পড়ে গেল। অতঃপর আমি তার শিরস্ত্রাণ খুলে ফেললাম এবং তার দাড়ি ধরে তার শিরশ্ছেদ করে ফেললাম। এরপর রাসূল কে তার কর্তিত মাথা নিয়ে গিয়ে দেখালে রাসূল তাঁর মৃতদেহ দেখতে চাইলেন। আমি তাঁকে তাও দেখালাম। এরপর রাসূল ﷺ বললেন, "সে হচ্ছে এই উম্মতের ফেরাউন" এবং তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন ও আবু জাহলের তরবারিটি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে দিয়ে দিলেন। ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় রয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ শেষ মুহূর্তে আবু জাহলের শিরশ্ছেদ করতে চাইলে সে বলে উঠল, "হে রাখাল, তুমি তো খুব উঁচু স্থানে উঠে গেছো"। উল্লেখ্য, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ মক্কায় ছাগল চরাতেন। এজন্য তাঁকে আবু জাহল রাখাল বলে সম্বোধন করেছিল।

উমাইয়া ইবনে খালাফের লাশ অত্যাধিক ফুলে যায়। একারণে লাশের গা থেকে বর্ম খুলতে গিয়ে লাশটি খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়। সে স্থানেই লাশটি মুরুভূমির তপ্ত পাথর দিয়ে চাপা দেওয়া হয়। এটাই আল্লাহর তাক্বদীর- যে তপ্ত মরুভূমির পাথরে তিনি একদিন বিলাল কে চাপা দিতেন সেই পাথরের নিচেই তার খণ্ড-বিখণ্ড মৃতদেহ চাপা পড়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ!

যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে মতবিরোধঃ-

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন, "যুদ্ধবন্দিদের আটক করা হলে, রাসূল এদের সম্পর্কে আবু বকর ও উমরের সাথে পরামর্শ করলেন। আবু বকর রা: তাদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে মুক্তি দেওয়ার জন্য সুপারিশ করলেন এবং বললেন, এতে কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের শক্তি বাড়বে এবং হতে পারে, তারা ভবিষ্যতে ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিবে। কিন্তু উমর রা: বললেন, "তাদের প্রত্যেককেই তাদের মুসলিম আত্মীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হোক এবং তারা তাকে হত্যা করবে"। তিনি বললেন, "আকিল কে আলীর হাতে দিন, সে তার মস্তক ছিন্ন করবে। আমার বংশের অমুককে আমার হাতে দিন, আমি তাকে হত্যা করব"।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা: ভিন্ন বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা এর অতিরিক্ত একটি প্রস্তাবের কথা এসেছে। তিনি বলেছিলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, তাদেরকে ঘন জঙ্গলে প্রবেশ করিয়ে সেখানে আগুন জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দিন'। রাসূল আবু বকরের সিদ্ধান্তই পছন্দ করলেন। সকলের মত শোনার পর রাসূল বললেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ কিছু মানুষকে এতটাই কোমল হৃদয়ের অধিকারী করেছেন যে তার হৃদয় দুধের চেয়েও কোমল। আবার কিছু মানুষকে এতটা কঠোর হৃদয়ের অধিকারী করেছেন যে তা পাথরের চেয়েও কঠিন। হে আবু বকর, তোমার উদাহরণ ইব্রাহীম আ:।

তিনি বলেছিলেন-

হে পালনকর্তা, এরা অনেক মানুষকে বিপথগামী করেছে। অতএব যে আমার অনুসরণ করে,সে আমার এবং কেউ আমার অবাধ্যতা করলে নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা ইব্রাহীম,১৪:৩৬)

সাহাবায়ে কেরাম মুশরিকদের বন্দি করতে শুরু করলে সাদ বিন মুআজ মনক্ষুণ্ণ হন। রাসূল তার চেহারার এমন ভাব দেখে তাকে বললেন, "সঙ্গীদের কর্মকাণ্ডে হয়তো তুমি বিরক্ত হচ্ছ"। তিনি বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, ঠিকই বলেছেন। কাফের বাহিনীর বিরুদ্ধে এটি সর্বপ্রথম সুযোগ। তাদের বাঁচিয়ে রাখার চেয়ে মেরে ফেলাই ভালো হতো বলে আমি মনে করি"। রাসূল বন্দিদের সাথে বিভিন্ন রকম আচরণ করেছিলেন। দুইজনকে মাত্র হত্যা করা হয়, অধিকাংশকেই কেবল মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত দেওয়া হয়, কয়েকজনকে দয়াপরবশ হয়ে মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্তি দেওয়া হয় আবার যাদের মুক্তিপণ দেওয়ার সামর্থ ছিলনা তাদের কয়েকজনকে মুসলমানদের দশজন করে শিশুকে শিক্ষাদানের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়।

আবুল আস এর ঘটনা :-

আবুল আস মুক্ত হয়ে মক্কায় ফিরে আসেন এবং শর্তানুযায়ী যায়নাব রা.-কে মদীনায় পাঠিয়ে দেন। আবুল আস ছিলেন বড় ব্যবসায়ী। ঘটনাক্রমে সিরিয়া থেকে পণ্য আনার সময় তিনি আবারও বন্দি হন এবং তাকে আবারও ছেড়ে দেওয়া হয়। এবার তিনি ফিরে গিয়ে ব্যবসার অংশীদারদের বাবাও ছেড়ে বুঝিয়ে দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, 'মক্কায় ফিরে গিয়ে মুসলমান হওয়ার কারণ হলো, লোকেরা যেন বলতে না পারে, আমি তাদের সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়ার ভয়ে মুসলমান হয়ে গেছি অথবা আমাকে জোরপূর্বক মুসলমান বানানো হয়েছে।'

ইহুদিদের বেয়াদবি রাসুল ﷺ এর সাথে :-

একদিন একদল ইহুদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এসে বলল আসসামু আলাইকা ইয়া রাসুলুল্লাহ। কথাটি শুনতে আসসালামুয়ালাইকুম মনে হলেও

এর অর্থ হল তোমার মৃত্যু হোক। আয়িশা রা এ কথা শুনে খুবই রেগে গেলেন। তিনি ইহুদীদেরকে অভিশাপ দিতে লাগলেন। তখন রসূল তাকে নিষেধ করেন। ইহুদিরা এটা নিয়ে বলাবলি শুরু করল যে তারা রসূলকে নিয়ে এভাবে বলল তবু আল্লাহ তাদের শাস্তি দিচ্ছেন না? তারমানে মোহাম্মদ মিথ্যা বলে, তিনি আল্লাহর রাসূল নন আস্তাগফিরুল্লহ। এছাড়াও তারা মুনাফিকদের সাথে একত্রিত হয়। মদিনা সনদ এর চুক্তি সমূহের বিরোধিতা করে। ইসলামী দাওয়াত এর বিরোধিতা শুরু করে। মানুষকে মুসলিম হওয়া থেকে বিরত রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা শুরু করে।

আলী রাঃ ও ফাতিমাহ রাঃ এর বিয়ে:-

দ্বিতীয় হিজরিতে (মাসের ব্যাপারে মতভেদ আছে- যিলহাজ্ব/মুহাররাম/সফর) রাসূল তাঁর কনিষ্ঠ কন্যা ফাতেমার সাথে আলীর বিবাহ দেন। প্রথমে আবুবকর এবং উমার এই সৌভাগ্য লাভ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু রাসূল চুপ থাকেন। অতঃপর আবু বকরের পরামর্শক্রমেই আলী রাসূল কে এই প্রস্তাব দিলে রাসূল তা মঞ্জুর করেন। ভিন্ন বর্ণনায় রয়েছে, আলী সরাসরি প্রস্তাব দিতে লজ্জা পাচ্ছিলেন বিধায় তিনি ইঙ্গিতে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন। রাসূল অভিপ্রায়ের কথা জিজ্ঞেস করলে আলী তা স্বীকার করেন এবং রাসূল করেন। এই বিয়ের মোহরানা হিসেবে বদর যুদ্ধে প্রাপ্ত বর্মটি আলী তা বুঝতে পেরে তার তাঁর এই ইচ্ছা মঞ্জুর ফাতেমা কে দিয়ে দেন। ভিন্ন বর্ণনায় রয়েছে, এই বর্মটি উসমানের কাছে ৪৮০ দিরহামে বিক্রি করে প্রাপ্ত সম্পত্তি নিয়ে আলী রা: রসুল সা: এর কাছে হাজির হন।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন এর মধ্যে থেকে সুগন্ধি ও পোশাক ক্রয় করে নাও। তিনি তার প্রাণপ্রিয় কন্যার বিয়েতে উপহার হিসেবে একটি লেপ,একটি বালিশ, দুটি চাক্কি অর্থাৎ যাতা,একটি মশক এবং দুটি মাটির কলসি উপহার দেন।

গাযওয়া বনু কাইনুকা বা কাইনুকা অভিযানঃ-

আবু আউন থেকে ইবনে হিশাম বর্ননা করেছেন, এক মুসলিম মহিলা বনু কাইনুকা বাজারে দুধ বিক্রি করতেন, এবং বিশেষ প্রয়োজন এক ইহুদী স্বর্নকার এর দোকানে বসেন। কয়েক জন ইহুদী তাকে নিকাব খুলতে বলে। স্বর্নকার সুযোগ বুঝে তার কাপর এ গিট লাগিয়ে দেয় । উনি উঠতে গেলে তার কাপর খুলে বিবস্ত্র হয়ে যান। এই অবস্থা দেখে ইহুদীরা খুশীতে হাততালি দিতে থাকে । এই দৃশ্য দেখে এক মুসলিম ইহুদিদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে।ইহুদীরা তার উপর ঝাপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করে। তার পরিবার রসুল ﷺ এর কাছে বিচার দেয়। রসুল ﷺ এর ধৈর্য্যর সীমা অতিক্রম করে। তিনি পরিপূর্ণ যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবকে যুদ্ধের সেনাপ্রধান নিযুক্ত করেন এবং আবু লুবাবাকে মদীনার আমীর এর দায়িত্ব দেন। দ্রুত গতিতে বনু কায়নুকা এর দুর্গের দিকে পৌছান,দুর্গের সমস্ত প্রবেশপথ বন্ধ করে দেন। দিনটি ছিল হিজরি ২য় সনের শাওয়াল এর ১৫ তারিখ। ১৫ দিন পর্যন্ত অর্থাৎ যুলকাদার চাঁদ উঠা পর্যন্ত অবরুদ্ধ রাখেন। অবশেষে এ ভয় পেয়ে তারা আত্মসমর্পন করেন এবং রসুল ﷺ এর সব কথা মেনে নেয়ার অংগীকার করেন। আবু উবাই এর অনুরোধ এ নবী ﷺ তাদের হত্যা করেন না তবে তাদের মদীনা ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। নির্বাসন পক্রিয়া তত্তাবধানে ছিলেন উবাদা বিন সামিত। তাদেরকে সিরিয়ার আজরায়াত নামক স্থান পর্যন্ত রেখে আসেন।

গাজওয়ে কুদর :-

নবীজির কাছে খবর আসে বনু গাতফান এর শাখা গোত্র বনু সুলাইম মদিনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তখন নবীজি তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য ২০০ উট এবং শূন্য নিয়ে তাদের বাসভূমিতে যান। উদর নামক স্থানে পৌঁছানোর পর বনু সুলাইম পালিয়ে যায় এবং তাদের ৫০০ উট ও একজন গোলাম রেখে যায়।

গাজওয়ায়ে সাওয়ীক :-

আবু সুফিয়ান বদর যুদ্ধে পরাজয়ের পর মুসলমানদের সাথে লড়াই করার সুযোগ খুঁজতে থাকেন। তার মনের ভিতরে প্রতিশোধের আগুন জ্বলতে থাকে। সে প্রায় ২০০ অশ্বরোহী নিয়ে মদিনা আক্রমণের জন্য রওনা হয়। সাইব নামক স্থানে তাবু স্থাপন করে। ভোরবেলা সরাসরি মদিনা আক্রমণের সাহস না পেয়ে নিয়ে আশেপাশের এলাকায় ডাকাতি ও লুণ্ঠন শুরু করে।রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ খবর পেয়ে আবু লুবাবা ইবনে আব্দুল মুনজির রা: এর নিকট মদিনার দায়িত্ব দিয়ে সাহাবীদের একটি দল নিয়ে তাদের পেছনে ধাওয়া করে। আবু সুফিয়ান সেখান থেকে পালিয়ে যায় এবং পালানোর সুবিধার্থে অনেক সাওয়ীক বা ছাতু ফেলে যায়। এভাবে এর যুদ্ধের নাম হয় গাজওয়ায়ে সাওয়ীক বা ছাতুর যুদ্ধ।

গাতফান যুদ্ধঃ-

তৃতীয় হিজরিতে ৪৫০ জন লোক নিয়ে দাসুর বিন হারিস মুহারিবী মদীনায় আক্রমণ করতে আসে। নবীজি তার মোকাবেলায় বের হলে তারা পালিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নেয়। নবীজি নিশ্চিন্ত হয়ে ময়দান থেকে ফিরে আসেন। এ সময় হঠাৎ বৃষ্টি আরম্ভ হয়। এতে তাঁর পোশাক ভিজে যায়। তিনি তা শুকানোর জন্য একটি গাছে ঝুলিয়ে দেন এবং ওই গাছের ছায়ায় শায়িত হন। ওদিকে তারা পাহাড়ের উপর থেকে এ দৃশ্য দেখতে পায়। সে নবীজিকে ঘুমাতে দেখে খাপমুক্ত তরবারি নিয়ে তাঁর কাছে চলে এসে বলল, 'মুহাম্মাদ, এখন আপনাকেআমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে?' আল্লাহর রাসূল সামান্য বিচলিত না হয়ে উত্তর দিলেন, 'আল্লাহই আমাকে রক্ষা করবেন।' এ কথা শোনামাত্র দাসুরের দেহে কম্পন তৈরি হলো এবং তার হাত থেকে তরবারি পড়ে গেল। তখন নবীজি তরবারি উঠিয়ে বললেন, 'এবার বলো, এখন তোমাকে কে রক্ষাকরবে? তার কাছে এটা ছাড়া আর কোনো উত্তর ছিল না যে, 'কেউ না।' নবীজি দয়াবশত তাকে ক্ষমা করে দেন।

এ ঘটনায় দাসুর এতটাই প্রভাবিত হয় যে, সে নিজেও মুসলমান হয় এবং তার গোত্রে ফিরে গিয়ে বড় একজন ইসলামপ্রচারক হয়ে যায়।

হাফসা রা. ও যায়নাব রা.-এর সঙ্গে বিবাহ:-

তৃতীয় হিজরির শাবান মাসে হাফসা রা.-এর সঙ্গে এবং রমযান মাসে যায়নাব বিনতে খুযাইমা রা.-এর সঙ্গে নবীজির শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়।

সারিয়্যাতু যায়দ ইবনু হারিসাহ:-

এটা ছিল উহুদ যুদ্ধের আগে ৩য় হিজরিতে। কুরাইশরা তখন বদর যুদ্ধের পর খুব বেশি দুশ্চিন্তা গ্রস্ত ছিল। গ্রীস্মকাল চলে আসে এবং শাম এ তাদের বানিজ্যের সময় চলে আসে। সেই কাফেলাতে আমীর ছিল সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া। আসওয়াদ ইবনু আব্দুল মুত্তালিব এর পরামর্শ মতো ইরাকের রাস্তায় সফর করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এই যাত্রার খবর মদীনায় চলে যায়। রসুল ﷺ আক্রমনের প্রস্তুতি গ্রহন করেন। প্রায় ১০০ অশ্বারোহী একটি বাহিনী তৈরী হয় যার নেতৃত্বে ছিল যায়েদ ইবনু হারিস। যায়েদ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে পথ অতিক্রম করে এবং কুরাইশরা একেবারেই অসতর্ক অবস্থায় কারদা নামক স্থান এ অবতরন করে। মুসলিম বাহিনী অতর্কিত হামলা করে কাফেলা দখল করে নেয়। ফুরাত ইবনু হাইয়ান ও দুইজন কে বন্দী করেন। পরবর্তীতে ফুরাত ইবনু হাইয়াত রসুল ﷺ এর কাছে ইসলাম গ্রহন করেন।

উহুদ যুদ্ধ

মদিনার কাছাকাছি একটি পাহাড়ের নাম উহুদ। উহুদের যুদ্ধ যেখানে সংঘটিত হয় সেখানে হারুন আ: এর কবর রয়েছে। এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে সর্বসম্মতিক্রমে তৃতীয় হিজরের শাওয়াল মাসে। তবে তারিখের ব্যাপারে কয়েকটি মত রয়েছে ৭,৮,৯,১০,১১। বদরের যুদ্ধের পর মুশরিকরা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মদিনায় আক্রমণের পরিকল্পনা করে। তারা ৩০০০ সৈনিকের বিরাট বাহিনী নিয়ে মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। বাহিনীতে ৭০০ বর্ম, ২০০ ঘোড়া ও তিন হাজার উট ছিল। তারা ১৪ জন মহিলাকে সঙ্গে নেয়, যারা পুরুষদের আত্মমর্যাদা জাগিয়ে তুলবে,এবং তারা যখন পালাতে থাকবে তাদেরকে অভিসম্পাত করবে।নবীজির চাচা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করলেও মক্কায় জানাননি। তিনি তৎক্ষণাৎ দ্রুতগতিতে রসূল ﷺ এর কাছে খবর পাঠান। তখন কুরাইশরা মদিনার একদম কাছাকাছি চলে আসে। শহরে আক্রমণের আশঙ্কা থাকায় চারদিকে পাহারা বসানো হয়। সকালে নবীজি সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করে ১০০০ সৈন্য নিয়ে মদীনার বাইরে বের হন। বাহিনীতে মুনাফিক আবদুল্লাহ বিন উবাই এবং তার ৩০০ সহচরও ছিল। মাঝপথ থেকে তারা ফিরে আসে। ফলে মুসলিম বাহিনীতে অবশিষ্ট থাকে ৭০০ জন।

মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধযাত্রা ও প্রস্তুতিঃ

রাসূল তার সেনাবাহিনীকে তিন ভাগে ভাগ করেনঃ

১। মুহাজির বাহিনী এর পতাকা দেওয়া হয় মুসআব বিন উমায়েরকে।

২। কবীলায়ে আউসের আনসার বাহিনীর পতাকা দেওয়া হয় উসাইদ বিন হুযাইর এর হাতে।

৩। কবীলায়ে খাযরাজের আনসার বাহিনীর পতাকা দেওয়া হুবাব ইবনে মুনযির এর হাতে।

মুসলিমদের সেনাবাহিনীতে সৈন্য সংখ্যা ছিল ১০০০। তাদের মাঝে ১০০ জন ছিলেন বর্ম পরিহিত এবং ৫০ জন ছিলেন ঘোড়সওয়ার। অবশ্য মুসা ইবনে উক্কবা জোর দিয়ে বলেছেন, উহুদের যুদ্ধে মুসলিমগণের সাথে কোন ঘোড়াই ছিল না। ওয়াকেদি বলেন, শুধুমাত্র দুটি ঘোড়া ছিল। একটি রাসূলের কাছে, আরেকটি আবু বুরদাহ রা : এর কাছে। মদিনায় সালাত পড়ানোর ইমাম হিসেবে নিযুক্ত করা হয় আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমকে।সাদ বিন মুয়াজ এবং সাদ বিন উবাদা রা: মর্ম পড়ে রাসুলের আগে আগে চলছিলেন। সানিয়াতুল বিদা থেকে এগিয়ে গিয়ে তারা একটি বাহিনী দেখতে পান তারা অত্যন্ত উত্তম অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সেখানে অবস্থান করছিল। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলে তারা বলে তারা খাজরাযের মিত্র ইহুদি। তারা মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চায় কিন্তু নবীজির যুদ্ধে কোন কাফিরদের সহায়তা নিতে চান না।

এবং রাসূল সাঃ চেয়েছিলেন উহুদ পাহাড় কে পিছনে রেখে এবং মদীনাকে সামনে রেখে শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে। তাই শত্রুবাহিনীকে এড়িয়ে ভিন্ন পথে উহুদ পাহাড়ের সামনে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। ওয়াকিদি বর্ণনা করেছেন, রাসূল সাঃ রাতের প্রথম অংশে ঘুমিয়ে মধ্যরাতে জেগে উঠলেন এবং এরপর উপযুক্ত রাস্তা খুঁজতে তিনি পথপ্রদর্শকদের সাথে পরামর্শ করলেন। তিনি জানতে চাইলেন মুসলিম বাহিনীকে গোপন পথে নিয়ে যেতে পারবে এমন কে আছে? আবু খাইসামা রাঃ বললেন, “আল্লাহর রাসূল! আমি পারবো"। এরপর তিনি রিবয়ী ইবনে কাইযী নামক এক মুনাফিকের বাগানের ভেতর দিয়ে মুসলিম সেনাবাহিনীকে নিয়ে যান। রাসূল সাঃ ও মুসলিম সেনাবাহিনীর আগমনের খবর পেয়ে সে মুনাফিক ব্যক্তি তাদের মুখে বালু নিক্ষেপ করতে থাকে এবং বলে, "যদি তুমি রাসুলুল্লাহ সাঃ হও, তাহলে আমার বাগানে প্রবেশ করা তোমার জন্য বৈধ নয়"। ভিন্ন বর্ণনায় রয়েছে, সে নিজের হাতে এক মুষ্টি মাটি নিয়ে বলে, “হে মুহাম্মাদ! যদি আমি পারতাম তাহলে এই মাটি তোমার মুখে নিক্ষেপ করতাম”। একথা শুনে সাহাবীরা তাকে হত্যা করতে চাইলে রাসুল সাঃ নিষেধ করলেন এবং বললেন, “তোমরা তাকে হত্যা করো না কারণ তার দৃষ্টিশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি কোনটাই নেই "।

কিশোরদের আগ্রহ :-

মদীনা থেকে বের হয়ে সৈন্যদের যাচাই-বাছাইয়ের সময় কমবয়সী ছেলেদের ফেরত পাঠানো হয়। কিন্তু কিশোরদের মধ্যে জিহাদের জযবা এত বেশি ছিল যে, রাফে বিন খাদিজকে যখন বলা হয়, 'তোমার বয়স কম, তুমি ফিরে যাও', তখন তিনি পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে দাঁড়ান, যাতে তাকে লম্বা মনে হয়। ফলে তাকে বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।সমবয়সী সামুরা বিন জুন্দুব তাকে বাহিনীতে নিতে দেখে বললেন, 'আমি তো রাফের সাথে লড়াইতে তাকে আছাড় দিতে পারি। তাকে নেওয়া হলে আমাকেও নেওয়া উচিত।' তার কথামতো দুজনকে মোকাবেলার সুযোগ দেওয়া হয়। সামুরা রাফেকে ভূপাতিত করেন। ফলে তাকেও যুদ্ধে নেওয়া হয়।

আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার সঙ্গীদের পলায়নঃ

রাসূল (সা) ও সাহাবীরা মদিনার মধ্যস্থলে যখন পৌঁছান তখন মাগরিবের সময় হয়ে গিয়েছে। রাসূল (সা) সেখানেই শিবির স্থাপন করে রাত্রিযাপনের সিদ্ধান্ত নেন। ৫০ জন সাহাবীকে মুসলিম শিবিরে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়। তাদের নেতা ছিলেন মুহাম্মদ বিন মাসলামা। যাক্বওয়ান ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু কায়স নির্দিষ্টভাবে রাসূলের পাশে থেকে রাসূলকে পাহারা দিচ্ছিলেন। সুবহে সাদিক হওয়ার পূর্বে রাসূল (সা) পথ চলতে শুরু করেন এবং 'শাওত' নামক স্থানে পৌঁছে ফজরের সালাত আদায় করেন। এখানে পৌঁছে মুসলিম এবং মুশরিক সেনাবাহিনী একে অপরকে দেখতে পাচ্ছিল। এখানেই মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সে তার তিনশ' সৈন্য নিয়ে বলতে শুরু করে, অযথা কেন জীবন দিতে যাব! সে যুক্তি উপস্থাপন করে যে, রাসূল (সা) তার কথা মেনে মদিনার ভেতরে যুদ্ধ না করে অন্যদের কথা মেনে মদিনা থেকে বের হয়েছেন। তাই রাসূলের সাথে সে যুদ্ধ করতে বাধ্য নয়। এই কথা বলে সে ৩০০ জন সৈনা নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মদিনায় ফিরে আসে। তার উদ্দেশ্য ছিল, নিজে প্রাণভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিরত থাকা এবং মুসলিম সেনাবাহিনীর মাঝে সন্দেহ এবং ভীতি সৃষ্টি করে দেওয়া। তার এই পরিকল্পনা অনেকটা সফল হতে

চলেছিল। কেননা সে চলে আসার পর আওস গোত্রের বনু হারীসা এবং খাযরাজ গোত্রের বনু সালামাহ পিছু হটতে যাচ্ছিল এবং তারা ফিরে যাবার ব্যাপারে চিন্তা করছিল। কিন্তু আল্লাহ তাদের অন্তরের পরিবর্তন ঘটান এবং তারা ফিরে যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করে।

রনক্ষেত্র:-

রণক্ষেত্রে পৌঁছে নবীজি সাহাবীদেরকে সারিবদ্ধ করেন। উহুদ পাহাড় পেছনে থাকায় এদিক থেকে আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। নবীজি ৫০ জনের একটি দলকে পাহাড়ে মোতায়েন করে নির্দেশ দেন, মুসলমানদের জয়-পরাজয় যেটাই হোক না কেন, তারা যেন নিজ স্থান থেকে সরে না যান।যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তুমুল লড়াই চলতে থাকে। একপর্যায়ে মুসলমানদের বিজয়ের লক্ষণ ফুটে ওঠে। কুরাইশরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পালাতে থাকে। মুসলমানরা গনিমতের সম্পদ জমা করতে শুরু করে। এই পরিস্থিতি দেখে পেছনের পাহাড়ে মোতায়েনকৃত দলটি নিজেদের স্থান ছেড়ে ময়দানে চলে আসে। তাদের নেতা আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের তাদেরকে অনেক নিষেধ করেন। কিন্তু তারা মনে করেন, এখন আর সেখানে অবস্থানের প্রয়োজন নেই।এটা ভেবে তাদের অধিকাংশই পাহাড় থেকে নেমে আসেন। মাত্র ১১ জন সেখানে রয়ে যান।খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. তখনো মুসলমান হননি। তিনি কাফেরদের পক্ষে যুদ্ধে করছিলেন। তিনি পেছন দিকের পাহাড় পর্যবেক্ষণ করছিলেন আর সুযোগ খুঁজছিলেন। মুসলমানদের সেখান থেকে সরে পড়তে দেখে তিনি অতর্কিতে আক্রমণ করেন। আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের ও তার অবশিষ্ট সঙ্গীরা বীরত্বের সাথে লড়াই করে শহীদ হয়ে যান। ফলে পথ বাধামুক্ত হয়ে পড়ে এবং খালিদ তার বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করেন। এতে উভয় পক্ষ এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে পড়ে যে, মুসলমানদের হাতেই মুসলমানরা আঘাতপ্রাপ্ত হতে থাকে।এ সময় মুসআব বিন উমাইর রা. শহীদ হন। তার চেহারা নবীজির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। এজন্য তার শাহাদাতের পর ভুল সংবাদ ছড়িয়ে

পড়ে যে, নবীজি শহীদ হয়েছেন। কিছু বর্ণনায় আছে, কোনো শয়তান বা কাফের উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলেছিল, 'মুহাম্মাদ নিহত হয়েছেন!'

এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই মুসলিম বাহিনীতে হতাশা ছেয়ে যায়। বড় বড় বীর সাহাবীর পা বসে যায়। তবে প্রাণোৎসর্গকারী বেশ কিছু সাহাবী তখনো লড়ে যাচ্ছিলেন। সবার ব্যাকুল দৃষ্টি নবীজিকে খুঁজে ফিরছিল। সবার আগে কাব বিন মালেক রা.-এর দৃষ্টি পড়ে নবীজির দিকে। তিনি খুশিতে চিৎকার করে বলে ওঠেন, 'মুবারক হোক! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ আছেন!' এ কথা শুনে সাহাবীরা সেদিকে ছুটে যান। কাফেররাও সেদিকে অগ্রসর হয়। তারা কয়েকবার আক্রমণ করে। তবে নবীজি নিরাপদ থাকেন। কাফেররা আক্রমণ করলে নবীজি বলেন, 'আমার জন্য প্রাণোৎসর্গকারী কে আছে?' যিয়াদ বিন সাকান রা. চারজন সঙ্গীসহ এগিয়ে যান এবং সবাই বীরত্বের সাথে লড়াই করে শহীদ হন। যিয়াদ আহত হয়ে নিচে পড়ে গেলে নবীজি বলেন, 'তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।' লোকেরা তাকে উঠিয়ে নিয়ে আসে। তখন পর্যন্ত তার শ্বাসপ্রশ্বাস চলছিল। তিনি নবীজির পায়ের ওপর মুখ রাখেন। এ অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয়।

নবীজির জখম:-

কুরাইশের বিখ্যাত বাহাদুর আবদুল্লাহ বিন কামিয়া সাহাবীদের ব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে যায় এবং নবীজির চেহারায় তরবারির আঘাত হানে। এর ফলে লোহার দুটি কড়া নবীজির চেহারায় বিঁধে যায় এবং একটি দাঁত শহীদ হয়। আবু বকর রা. কড়া বের করতে এগিয়ে আসেন। তখন আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা. বলেন, 'আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে এই খেদমতের সুযোগ দিন।' এরপর তিনি নবীজির কাছে এসে হাতের বদলে নিজ দাঁত দিয়ে লোহার কড়া টেনে বের করেন। প্রথমবার একটি কড়া বের হয়। এর সঙ্গে আবু উবাইদার একটি দাঁত পড়ে যায়। এটি দেখে আবু বকর রা. দ্বিতীয় কড়া বের করতে উদ্যত হন। আবু উবাইদা আগের মতো আল্লাহর দোহাই দিয়ে

তাঁকে নিবৃত করেন এবং নিজের মুখ দিয়ে অপর কড়া বের করেন। এতে তার আরেকটি দাঁত পড়ে যায়।

এজন্য তাকে ডাকা হতো দাত ভাংগা উত্তম ব্যাক্তি।

এ সময় নবীজি একটি গর্তে পড়ে যান। কাফেররা মুসলমানদের জন্য গর্ত খুড়ে রেখেছিল।নবীজিকে গর্তে পড়ে যেতে দেখে সাহাবীরা তাঁকে ঘেরাও করে রাখেন। চারদিক থেকে তীর ও তরবারির বৃষ্টি হচ্ছিল। সাহাবীরা সেসবের আঘাত নিজেদের দেহে নিচ্ছিলেন। আবু দুজানা রা. ঝুঁকে নবীজির ঢাল হয়ে যান। এদিক থেকে যত তীর এসেছে, সব তার পিঠে বিদ্ধ হয়েছে। তালহা রা. তীর ও তরবারির আঘাত প্রতিহত করেন হাত দিয়ে, ফলে তার হাত কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল, তার দেহে সত্তরটির বেশি আঘাত লেগেছে। আবু তালহা রা. একটি ঢাল দিয়ে নবীজিকে রক্ষা করছিলেন। নবীজি ঘাড় উঁচু করে ময়দানে তাকালে আবু তালহা বললেন, 'আল্লাহর রাসূল, আপনি মাথা ওঠাবেন না। হতে পারে শত্রুর কোনো তীর আপনার দেহে বিদ্ধ হবে। আঘাত সহ্য করার জন্য আপনার আগে আমার বুক বিদ্যমান। এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমি নিহত হলে আমার ঠিকানা কোথায় হবে?' তিনি বললেন, 'জান্নাত।' ওই সাহাবীর হাতে কিছু খেজুর ছিল। এ কথা শুনে তিনি খেজুর নিক্ষেপ করে সোজা রণাঙ্গনে চলে গেলেন এবং লড়াই করে শাহাদাত বরণ করলেন।

কুরাইশের হতভাগা লোকেরা নির্দয়ভাবে নবীজির ওপর তীর নিক্ষেপ করছিল। অথচ রহমতুল লিল আলামিনের মুখে ছিল এই দোয়া :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

'হে আল্লাহ, আমার জাতিকে ক্ষমা করে দিন। কেননা, তারা জানে না।' নবীজির পবিত্র চেহারা থেকে রক্ত ঝরছিল। তিনি কাপড় দিয়ে রক্ত মুছতে থাকেন। তিনি বলেন, 'এই রক্তের একটি ফোঁটাও মাটিতে পড়লে সবার ওপর আল্লাহর আযাব অবতীর্ণ হতো!'

এই যুদ্ধে কাফেরদের ২২ বা ২৩ জন নিহত হয় আর মুসলমানদের ৭০ জন শহীদ হন।

শহীদদের লাশ ও দাফন :-

যুদ্ধের পর রাসূল সা:নিজে শহিদদের মৃতদেহ পরিদর্শন করে বলেন, "আমি এই লোকদের ব্যাপারে সাক্ষী থাকব। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে আহত হয় আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন এই অবস্থায় উঠাবেন যে তার ক্ষতস্থান দিয়ে শোণিতধারা বইতে থাকবে। এগুলোর রং তো রক্তের রঙের মতোই হবে। কিন্তু তার ঘ্রাণ হবে মেশকের ঘ্রাণের মতো"। বেশ কয়েকজন সাহাবি তাদের শহিদ আত্মীয় স্বজনদের মৃতদেহ নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু রাসূল তাদেরকে নির্দেশ দিলেন মৃতদেহ মদিনায় না নিয়ে তাদের শাহাদাতের স্থানে দাফন করতে।এবং শহিদদের দেহ থেকে অস্ত্র ও হাতিয়ার খুলে নিতে এবং গোসল ছাড়াই তাদের পরনের কাপড়ে তাদের দাফন করতে। প্রতি দুজনকে এক কাপড়ে জড়াতে এবং দুজনকে একই কবরে দাফন করার নির্দেশ দিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এদের মধ্যে কুরআন কার বেশি মুখস্ত ছিল? যার কুরআন মুখস্থ থাকতো তাকে আগে কবরে রাখতেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু হারাম রা :এবং আমর বিন জামূহকে রা : একই কবরে দাফন করা হয়। কেননা তাদের দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। হামজার মৃতদেহ মুশরিকরা অত্যন্ত খারাপ ভাবে বিকৃত করে। তার বোন সাফিয়া তার মৃতদেহ দেখতে চাইলে রাসূল সা: জুবায়েরকে বলেন, তিনি যেন তার মাকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। কারণ এই দৃশ্য তার মা সহ্য করতে পারবেনা। একথা শুনে সাফিয়া ধৈর্য ধারণ করার সংকল্প করলেন এবং বললেন, আমি জানতে পেরেছি আমার ভাইয়ের নাক কান কেটে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমার ভাই আল্লাহর পথে রয়েছে সুতরাং তার উপর যা কিছু করা হয়েছে তাতে আমি পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট আছি, আমি ইনশাআল্লাহ ধৈর্যধারণ করব। এরপর তিনি হামজাকে দেখেন তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। রাসূল-এর নির্দেশে হামজাকে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহেশের সঙ্গে দাফন করা হয়। তিনি ছিলেন হামজার ভাগিনা এবং

দুধ ভাই। খাব্বাব ইবনুল আরাত বর্ণনা করেছেন, হামজার জন্য কালো প্রান্তবিশিষ্ট একটি চাদর ছাড়া আর কোনও কাফনের কাপড় পাওয়া যায়নি। ওই চাদর দিয়ে মাথা ঢাকা হলে পা খোলা থাকত এবং পা ঢাকলে মাথা খোলা থাকতো। অবশেষে মাথা ঢেকে দেওয়া হল এবং পায়ের উপর 'ইযখির' (এক প্রকার ঘাস) চাপিয়ে দেয়া হলো। একই অবস্থা হয়েছিল মুসআব বিন উমাইর এর। তার জন্য একটি মাত্র চাদর পাওয়া গিয়েছিল যা দিয়ে পুরো শরীর ঢাকা যাচ্ছিল না। এই অবস্থায় রাসূল নির্দেশ দিলেন, তার মাথা চাদর দিয়ে ঢেকে দিতে এবং পায়ের উপর ইযখির বিছিয়ে দিতে , হানজালার মৃতদেহ অদৃশ্য ছিল। সাহাবিরা খুঁজতে খুঁজতে এক জায়গায় দেখলেন, তাঁর মৃতদেহ জমিন থেকে উপরে রয়েছে এবং সেখান থেকে টপটপ করে পানি পড়ছে। এ দৃশ্য দেখে তারা রাসূলকে জানালেন তখন রাসূল সা:

তাদেরকে বললেন, "ফেরেশতারা তাকে গোসল করিয়ে দিচ্ছেন"।

বললেন, "তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করো প্রকৃত ব্যাপারটি কী ছিল?" তার স্ত্রী জানালেন, তার গোসল ফরজ হয়ে গিয়েছিল এই অবস্থায় তিনি যুদ্ধে চলে গিয়েছিলেন এবং শাহাদাত বরণ করেন। এজন্য ফেরেশতারা তাকে গোসল করিয়ে দিচ্ছেন। এখান থেকেই তার নাম হয়ে যায় 'গসীলুল মালায়িকাহ' অর্থাৎ ফেরেশতাগণ কর্তৃক গোসলকৃত।

গাজওয়ায়ে হামররাউল আসাদ :-

মুসলিম বাহিনী মদিনায় ফিরে আসার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারলেন, আবু সুফিয়ান এবং কাফির বাহিনী ফিরে যাওয়ার পথে রওহা নামক স্থানে পৌঁছানোর পর সে তার বাহিনীকে বলছিল তোমরা কিছুই করতে পারলে না। তোমরা মুহাম্মদকে হত্যা করতে পারলে না। তাদের যুবতী নারীদের দাসী বানাতে পারলে না। এসব কথা নবীজির কানে পৌঁছালে তিনি ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের নিয়ে হামরাওল আসাদ অভিযানে বের হন। এখানে পৌঁছে তিনি কাফের বাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার জন্য তিন দিন পর্যন্ত অবস্থান করেন। কাফিররা মুসলমানদের মুখোমুখি হওয়ার

সাহস করে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে রাতের বেলা অধিক পরিমাণে আগুন জ্বালানোর আদেশ দিয়েছিলেন। প্রতি রাতে একসাথে প্রায় ৫০০ আগুন জ্বলতো। নিজেদের পলায়নপরতা গোপন রাখার উদ্দেশ্যে এবং মুসলিমদের ভয় দেখানোর জন্য আবু সুফিয়ান একটি নতুন বুদ্ধি করল। কবীলায়ে আব্দুল কায়েসের একটি মদিনাগামী কাফেলার সাথে দেখা হলে আবু সুফিয়ান তাদেরকে বলল, 'তোমরা মুহাম্মদকে গিয়ে বলবে আমরা তার ও তার দলের উপর হামলা চালিয়ে তার অবশিষ্ট অংশকে নির্মূল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি'। আর এই কথা পৌঁছে দিতে পারলে উকায বাজারে গিয়ে তাদেরকে প্রচুর পরিমাণে কিশমিশ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি করল। এই কাফেলা মুসলিম বাহিনীর পাশ দিয়ে অতিক্রমের সময় আবু সুফিয়ানের বার্তা পৌঁছে দিল। তখন আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন-

যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম; তাদের ভয় কর। তখন তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; কতই না চমৎকার কামিয়াবীদানকারী। অতঃপর ফিরে এল মুসলমানরা আল্লাহর অনুগ্রহ নিয়ে, তদের কিছুই অনিষ্ট হলো না। তারপর তারা আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত হল। বস্তুতঃ আল্লাহর অনুগ্রহ

অতি বিরাট।

(সূরা আলে ইমরান, ৩:১৭৩-১৭৪)

নবীজি তার সেনাবাহিনী নিয়ে সেখানে অবস্থান করতে লাগলেন কিন্তু যখন কাফেরদের আসার আর কোন সম্ভাবনা রইল না তখন তিনি নিরাপদে মদিনার পথে ফিরে গেলেন।

আর রাজীর মর্মান্তিক ঘটনা :-

চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে আজাল এবং কারাহ গোত্রের কয়েকজন ব্যক্তি রসূলুল্লাহর কাছে এসে জানালেন যে, তাদের মাঝে ইসলামের কিছু কিছু চর্চা রয়েছে। তারা পরিপূর্ণভাবে দিন শিক্ষার জন্য কয়েকজন সাহাবীকে চাইলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৬ জন মতান্তরে ১০ জন সাহাবীকে তাদের সাথে প্রেরণ করেন।রাবেগ এবং জেদ্দার মধ্যবর্তী স্থানে যখন তারা পৌঁছায় তখন তাদের উপর বনু হুজাইলের একটি শাখা গোত্র বনু লাহিয়ান সাহাবীদের উপর আক্রমণ করে। আজল এবং কারা গোত্রের লেলিয়ে দেয়ার ফলে প্রায় ১০০ জন তীরন্দাজ তাদের আক্রমণ করে। সাহাবীরা পাহাড়ের চূড়ায় আশ্রয় নেন। তারা তাদেরকে ঘিরে ফেলে এবং প্রতিশ্রুতি দেয় তারা নেমে আসলে তাদেরকে রক্ষা করা হবে। আসিম রা: তাদের প্রস্তাবে রাজি হয় না তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। একের পর এক তীর বর্ষণের কারণে ৭ জন সাহাবী সেখানেই শহীদ হলেন। বনু লাহইয়ান আরো একবার প্রতিশ্রুতি দেয় ফলে বাকি তিন জন নেমে আসে। সাহাবীরা নেমে আসার সাথে সাথে তাদেরকে বেঁধে ফেলা হয়। এদের মধ্যে তৃতীয় সাহাবী তাদের সাথে যেতে অস্বীকার করলে তাকে হত্যা করা হয়। জায়েদ বিন দাসিন্নাহ রা: এবং খুবাইব রা: কে নিয়ে মক্কায় বিক্রি করে দেয়। খুব আইপকে হত্যা করার জন্য মক্কাবাসী থাকে হারাম শরীফের বাইরে তানঈম নামক স্থানে নিয়ে যায়। তাকে শুলে চরানোর পূর্ব মুহূর্তে তিনি দুই রাকাত সালাত পড়ার জন্য অনুমতি চাইলেন। তাকে অনুমতি দেয়া হলো। সালাম ফিরানোর পর তিনি বলেন যদি তোমাদের এই বলার ভয় না থাকতো যে, আমি যা কিছু করছি তা ভয় পাওয়ার কারণে করছি তাহলে আরো দীর্ঘ সময় আমি সালাত আদায় করতাম। তিনি আরো বলেন হে আল্লাহ তাদেরকে এক এক করে গুনে নাও। অতঃপর তাদেরকে বিক্ষিপ্তভাবে মৃত্যু দাও এবং কাউকে অবশিষ্ট রেখো না। বন্দি অবস্থায় তাকে আঙ্গুর ফল খেতে দেখা গিয়েছিল। অথচ সেই সময় মক্কায় খেজুরও পাওয়া যাচ্ছিল না।

বীরে মাউনার ঘটনা:-

রাজীর মর্মান্তিক হত্যাকান্ড যে মাসে ঘটে আরেকটি ঘটনা ঘটে। আবু বারা আমের বিন মালিক নামে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর সাথে দেখা করতে আসলেন। রাসূল তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি ইসলাম গ্রহণও করলেন না আবার পরিত্যাগও করলেন

না। তিনি নবিজিকে অনুরোধ করলেন নযদ বাসীদেরকে ইসলামের দেয়ার জন্য কিছু সাহাবীকে প্রেরণ করতে। তিনি নবীজিকে কথা দেন সাহাবীদের আশ্রয় দিবেন। এরপর রাসুল ৪০ জন মতান্তরে ৭০ জন আবু বারার সাথে পাঠালেন। এ দলের নেতা নিযুক্ত করা হয় মুনযির বিন আমির রা: কে। সাহাবীরা দিনের বেলা জঙ্গল থেকে জ্বালানি সংগ্রহ করত এবং রাতের বেলা কুরআন পড়তেন, শিক্ষা দিতেন, আল্লাহর ইবাদতে ব্যস্ত থাকতেন। এভাবে বীরে মাউনাতে পৌছান এবং তারা সেখানে তাবু খাটান। হারাম মিলহান রা : সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহের পত্র দিয়ে আমির বিন তুফাইলের কাছে পাঠান। তিনি সেই চিঠি ছুয়েও দেখলেন না বরং হারাম রাদিয়াল্লাহু আনহু কে বর্শা দিয়ে আঘাত করে হত্যা করেন। এরপর আমির অবশিষ্ট সাহাবাদেরকে হত্যা করার জন্য তার গোত্রকে আহ্বান জানালো। কিন্তু তারা রাজি না হলে বনু সুলাইম গোত্রকে সে আহ্বান জানাল। বন্ধু সুলাইমের উসাইয়্যা, রি'ল এবং যাকাওয়ান তার আহবানে সাড়া দিয়ে সাহাবীদেরকে সেখানেই শহীদ করে ফেলল। কেবলমাত্র জীবিত ছিলেন কা'ব ইবনে যায়দ ইবনে নাজ্জার রাঃ। তাকে শহীদানের মধ্যে থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসা হয়। খন্দকের যুদ্ধ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন।

এরপর আমির অবশিষ্ট সাহাবাদেরকে হত্যা করার জন্য তার গোত্রকে আহ্বান জানালো। কিন্তু তারা রাজি না হলে বনু সুলাইম গোত্রকে সে আহ্বান জানাল। বনু সুলাইমের উসাইয়্যা, রি'ল এবং যাকাওয়ান তার আহবানে সাড়া দিয়ে সাহাবীদেরকে সেখানেই শহীদ করে ফেলল। কেবলমাত্র জীবিত ছিলেন কা'ব ইবনে যায়দ ইবনে নাজ্জার রাঃ। তাকে শহীদানের মধ্যে থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসা হয়। খন্দকের যুদ্ধ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন।

ঘটনাস্থলের আশপাশে আরো দুজন সাহাবি আমর বিন উমাইয়্যা যমরী রাঃ এবং মুনযির ইবনে উকবা ইবনে আমের রাঃ উট চরাচ্ছিলেন। তারা ঘটনাস্থলে পাখি ওড়াউড়ি করতে দেখে সেখানে গিয়ে পৌঁছেন এবংঅন্যদের সাথে যুদ্ধ করতে শুরু করেন। মুনযির রা: শহীদ হয়ে যান আর আমর ইবনে উমাইয়্যা রা: বন্দী হন।

জায়নাব বিনতু খুজায়মা ও উম্মু সালামার সাথে বিবাহ :-

হিজরতের প্রায় ৩১ মাস পর তৃতীয় হিজরির রমজান মাসে রাসুল সা: জায়নাব রা: এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তার স্বামী আব্দুল্লাহ ইবনু জাহশ উহুদ যুদ্ধে শহীদ হোন।

আবু সালামা বনু আসাদ এর বিপক্ষে অভিযান এ যান। এই অভিযান সংঘটিত হয়েছিল চতুর্থ হিজরির মহরম মাসে। অভিযান থেকে ফিরে আসার পর আবু সালামা ইন্তেকাল করেন। ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর নবীজি উম্মু সালামাকে বিয়ে করেন।

বদর দ্বিতীয় যুদ্ধ :-

বদর হয়েছিল হিজরী ২য় বর্ষে, আর উহুদের যুদ্ধ ৩য় বর্ষে। এর রেশ ধরে হিজরী চতুর্থ বছরে কাফিরদের নেতা আবু সুফিয়ান মুসলিমদের তৃতীয়বারের মতো চ্যালেঞ্জ করে। সে দুই হাজার সৈন্যের শক্তিশালী একটি দল নিয়ে মক্কা ত্যাগ করে। কিন্তু কিছু পথ যাওয়ার পর সে মন পরিবর্তন করে। সবার উদ্দেশে বলে, 'আমার মতে, স্বচ্ছলতার বছর ছাড়া যুদ্ধে অংশ নেওয়া সমীচীন হবে না। বরং যে বছর তৃপ্তির সাথে পশুদের ভালো ঘাসপাতা খাওয়াতে পারবে এবং নিজেরা ইচ্ছেমতো দুধপান করতে পারবে, সে বছরই যুদ্ধ করা ভালো হবে। এবার শুষ্ক মৌসুম। আমি ফিরে যাচ্ছি, তোমরাও ফিরে চলো।' হতে পারে এ কথাগুলো আবু সুফিয়ানের অজুহাত মাত্র। মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে কুরাইশরা এর আগেও খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি। হয়তো ঝোঁকের বশে সে চ্যালেঞ্জ করে বসেছে কিন্তু পরে বুঝতে পারছে খুব একটা সুবিধা করা যাবে না।

কিন্তু রাসূলুল্লাহর দৃঢ়তায় কোনো ফাটল ধরেনি। নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত জায়গায় দেড় হাজার মুজাহিদ নিয়ে রাসূলুল্লাহ শিবির স্থাপন করলেন। সেখানে আট দিন অবস্থান করলেন। ওদিকে কুরাইশদের দেখা নেই। সেখানে অবস্থানকালে তাঁর সাথে দেখা হলো বনু দামরা গোত্রের মুখশীর সাথে। ইতিপূর্বে এই গোত্রের সাথে মুসলিমদের শান্তিচুক্তি

ছিল। মুখশী রাসূলুল্লাহ সা:কে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনারা কি কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যই এখানে এসেছেন?' রাসূলুল্লাহ সা: বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা সেজন্যই এসেছি। আর তোমরা যদি চাও তাহলে আমাদের সাথে যে চুক্তি ছিল তা প্রত্যাহার করতে পারো। সেক্ষেত্রে আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের মাঝে ফয়সালা করেন।' মুখশী জবাব দিল, সে বললো, 'নাহ, এমন কিছু করার কোনো প্রয়োজন দেখি না। '

রাসূলুল্লাহ সা: এর এই কথাগুলো বলে মুখশীকে সূক্ষ্ম একটি ইঙ্গিত দিচ্ছেন; আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার ক্ষমতা রাখি, সেই শক্তি আমাদের ভালোই আছে। চুক্তির সময়সীমা বাড়ানোর ব্যাপারে তোমাদের প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের নেই।

খন্দক যুদ্ধ বা গাজওয়ায়ে আহযাব

রসুল ﷺ যখন মদিনায় হিজরত করে তখন সন্ধি করে নেন। মুসলমান মুসলমানরা সর্বদা চুক্তি রক্ষা করার ব্যাপারে সচেতন ছিল। নবীজির মদিনা আগমনের আগে ইহুদিরা মদিনাতে ক্ষমতাসিল ছিল। মদিনাতে নবীজির এবং ইসলামের শান শওকত বৃদ্ধি পেতে দেখে তারা ভিতরে ভিতরে ভীষন রকমের প্রতিহিংসা তৈরি করতে থাকে। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের জয়ের পরে তাদের ক্রোধ বাড়তে থাকে। তারা প্রকাশ্যে চুক্তি ভঙ্গ করতে থাকে। বনু কাইনোকা যুদ্ধের পর বনু নাজির বিদ্রোহ করে। সমস্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করে নবীজি যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। তাদেরকে কেল্লাতে আবদ্ধ রেখে পরবর্তীতে দেশান্তর করা হয়। এদিকে মক্কার কুরাইশরা ইহুদিদের এবং মুনাফিকদের উস্কানি দিতে থাকে। তাদের মধ্যে মিত্রতা গড়ে ওঠে।

অবশেষে পঞ্চম হিজরীর জিলকদ মাসে তারা নিজেদের পূর্ণ শক্তি একত্রিত করে মদিনায় আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। নবীজির কাছে সংবাদ পৌঁছালে তিনি সাহাবীদের নিয়ে মাসোয়ারা করেন। সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহু পরামর্শ দেন ময়দানে বের

হয়ে যুদ্ধ না করে যেদিক থেকে তারা মদিনায় প্রবেশ করতে পারে, সেই জায়গাগুলোতে পরিখা বা খন্দক খনন করা হোক।

প্রায় তিন হাজার সাহাবী কে নিয়ে নবীজি পরীক্ষা খনন আরম্ভ করেন। ছয় দিনে পাঁচ গজ গভীর পরীক্ষা খনন করা হয়। পরীক্ষা খননের সময় বিরাট একটি পাথর বের হয়। কেউ এটি ভাঙতে সক্ষম হয় না। নবীজি এসে নিজ হাতে পাথরের উপর একটি আঘাত করেন আর সেটি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এভাবেই পরীক্ষা খননের কাজ সমাপ্ত হয়।

কিছুদিন পর কাফেরদের মদিনা অবরোধ করে এবং প্রায় ১৫ দিন মুসলমানরা অবরুদ্ধ থাকেন। এই সময় বনু কুরাইযাও চুক্তি ভঙ্গ করে শত্রুদের সাথে মিত্রতা করে।

অবরোধের কারণে মদিনা শহরের দুশ্চিন্তা ছড়িয়ে পড়ে। খাবারের স্বল্পতা দেখা দেয়। এমনকি আল্লাহর নবী উদার যন্ত্রণার সইতে না পেরে পেটে পাথর বেঁধে রাখে।

কিন্তু শত্রু বাহিনী পরীক্ষা পাড়ি দিতে না পেরে অনবরত তীর ও পাথর বর্ষণ করতে থাকে।

ঝড় ও রবের সাহায্য:-

অবশেষে আল্লাহ সুবহানাতায়ালা মুসলমানদের সাহায্য করেন। কাফেরদের বাহিনীর স্থানে প্রচন্ড ঝড় শুরু হয়। তাদের তাঁবুর খুঁটি উপড়ে পড়ে যায়। তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা ভয় দ্রুত ময়দান ত্যাগ করে, এবং পালিয়ে যায়।

এই বছরের কিছু ঘটনা:-

১.এ বছর হজ ফরজ হয়। তারিখের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

২.ঝুমাদুল উলা মাসে নবীজির নাতি আব্দুল্লাহ বিন ওসমান মৃত্যুবরণ করেন.

৩.শাওয়াল মাসের শেষের দিকে আয়েশা রা: এর মা ইন্তেকাল করেন।

৪.জিলকদ মাসে জয়নাব বিনতে যাহাশ রা: এর সাথে নবীজি বিবাহ সম্পন্ন হয়।

৫.মদিনায় ভূমিকম্প ও চন্দ্রগ্রহণ হয়।

বনু আল- মুস্তালিকের যুদ্ধ :-

এই সময় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযান ছিল খুযাআ গোত্রের বিরুদ্ধে সংঘটিত বনু মুস্তালাকের যুদ্ধ।তাদের সাথে কুরাইশদের মিত্রতা ছিল। মদিনা আক্রমণের নিশ্চিত খবর পেয়ে রসূল সা: প্রায় ৭০০ মুজাহিদ নিয়ে তাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে। যে জায়গাটিতে যুদ্ধ সংঘটিত হয় সেটার নাম আল মুরাইসী। তারা কোন প্রতিরোধই করতে পারে না। তাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়, স্ত্রী ও সন্তানদের বন্দি করে নিয়ে আসা হয়। সাধারণত মুসলমানরা যখন শত্রুর উপর আক্রমণ করে তখন ইসলাম গ্রহণের জন্য তিন দিন সময় দেয়া হয়ে থাকে। তাদেরকে বলা হয়, মুসলিম হও নাহলে জিযিয়া দাও। আর যদি কোন প্রস্তাবে রাজি না হও তাহলে যুদ্ধ কর। কিন্তু বনু মুস্তালিককে সময় দেয়া হয় না কারণ তাদেরকে আগেই ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। এবং তারা স্বইচ্ছায় কুরাইশদের মিত্র হিসেবে বেছে নেয়।

রাসূলুল্লাহর সাথে জুয়াইরিয়্যাহর বিয়ে:-

জুয়াইরিয়্যাহ ছিলেন বনু মুস্তালিকের গোত্রনেতা আল হারিসের মেয়ে। তাঁর সাথে রাসূলুল্লাহ সা: বিয়ে নিয়ে প্রবল ঈর্ষা আর দুশ্চিন্তায় ভুগছিলেন মা আইশা। মজার এই ঘটনাটি তাঁর মুখেই শোনা যাক.'যখন আল্লাহর রাসূল বনু মুস্তালিকের বন্দী নারী ও শিশুদের বণ্টন করে দিলেন, তখন জুয়াইরিয়্যাহ পড়লেন সাবিত ইবন কাইসের ভাগে। তিনি সাবিতের সাথে মাকাতুবা (দাসমুক্তির চুক্তি) করলেন। জুয়াইরিইয়্যাহ দেখতে ছিলেন খুবই মিষ্টি, আর অসম্ভব সুন্দরী! এতটাই সুন্দরী যে, যে-ই তাকে দেখবে, সে-ই তার প্রেমে পড়ে যাবে! তিনি রাসূলুল্লাহর কাছে এসে দাসমুক্তির অর্থ পরিশোধে সাহায্য চাইলেন। আল্লাহর কসম! আমি যখন তাকে আমার দরজায় দেখলাম, (প্রচণ্ড ঈর্ষার কারণে) তাকে আমারএকটুও ভালো লাগেনি। আমি জানতাম, যে রূপ আমি তার মধ্যে দেখছি, তা আল্লাহর রাসূলের চোখ এড়াবে না।

জুয়াইরিয়্যাহ আসলেন, সরাসরি রাসূলুল্লাহকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি আল-হারিসের মেয়ে জুয়াইরিয়্যাহ, আমার বাবা গোত্রের নেতা। আর এখন আমি হয়েছি সাবিতের দাসী! আমার কেমন লাগছে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আমি নিজেকে মুক্ত করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। আপনি আমাকে চুক্তির অর্থ পরিশোধে সাহায্য করুন! আল্লাহর রাসূল বললেন,

আচ্ছা, তোমাকে যদি এর থেকেও ভালো কিছু দেওয়া হয়?

তিনি জানতে চান সেটি কি?

আমি তোমার মুক্তিপণ পরিশোধ করবো আর তোমাকে বিয়ে করে নেব।

হে আল্লাহর রাসূল, আমি অবশ্যই তা কবুল করবো।

রাসূলুল্লাহ জুয়াইরিয়্যাহকে বিয়ে করে নিলেন। সবাই তখন বলতে লাগলো, আরে! এরা তো রাসূলুল্লাহর শ্বশুরবাড়ির লোকজন, এদেরকে আমরা কী করে দাস বানিয়ে রাখি! তাই তারা তাদের ভাগের সকল বন্দীকে মুক্ত করে দিল। জুয়াইরিয়্যাহর মতো আর কেউ নিজ গোত্রের জন্য এত বরকত বয়ে এনেছে বলে আমাদের জানা নেই।

এই এক নারীর কারণে বনু মুস্তালিকের একশ পরিবার আজাদ হয়ে যায় "এই ঘটনার পর বনু মুস্তালিক গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে।

হুদাইবিয়ার ঐতিহাসিক সন্ধি:-

রাসুল ﷺ এর সপ্ন:-

ষষ্ঠ হিজরীতে একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দেখলেন, তিনি তার সাহাবীগণকে নিয়ে মসজিদুল হারামে প্রবেশের অধিকার লাভ করেছেন। তিনি আরো দেখেন তিনি কাবা ঘরের চাবি নিয়ে সাহাবীগণের সাথে আল্লাহর ঘর তাওয়াফ এবং উমরা সম্পন্ন করেছেন। যখন তিনি সাহাবীদের এ সম্পর্কে জানালো তারা খুবই আনন্দিত হলো। এবং তারা বুঝতে পারল খুব শীঘ্রই তারা মক্কার প্রবেশাধিকার পাবে।

মক্কার পথে মুসলমান বাহিনী :-

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে মক্কা যাওয়ার জন্য মদিনা এবং মদিনার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলিমদের মাঝে ঘোষণা করে দিলেন। রসূল তার নিজের পোশাক পরিচ্ছন্ন করে নিলেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রা: কে মদিনার ভারপ্রাপ্ত আমি নিযুক্ত করেন। ষষ্ঠ হিজরির ১ লা যিলকদ মাসে তিনি মক্কার দিকে রওনা হন। সাথে ছিল উম্মুল মুমিনের উম্মে সালামা রা: এবং ১৪০০ মতান্তরে ১৫০০ জন সাহাবী। তাদের সাথে কোষবদ্ধ তরবারি ছাড়া তেমন কোনো অস্ত্র ছিলনা। রসূল সা: জুলহুলাইফা পৌঁছে কোরবানির পশুকে হার পড়ালেন, উটের পিঠের উঁচু জায়গা কেটে চিহ্নিত করলেন এবং ওমরার জন্য ইহরাম বাধলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল মক্কা বাসী যাতে বুঝতে পারে নবীজি যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন না। বরং শান্তিপূর্ণভাবে হজ্জ সম্পন্ন করার জন্য মক্কায় এসেছেন। কিন্তু কুরাইশরা সংকল্প করে কোনভাবেই তাদেরকে বাইতুল্লাহ তে যেতে দিবে না।

সন্ধি এবং বাইয়াতে রিদওয়ান:-

সাহাবীদের যাত্রাবিরতির স্থানে একটি শুকনো কুয়া ছিল। নবীজির বরকতে সেটিতে এত পানি আসে যে, সবাই তৃপ্তি সহকারে পান করেন এখানে পৌঁছে নবীজি উসমান রা.-কে মক্কা প্রেরণ করেন কুরাইশদের এ কথা জানানোর জন্য যে, নবীজি এখন শুধু বাইতুল্লাহর যিয়ারত ও উমরা করতে এসেছেন, কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নয়। উসমান রা. মক্কায় যাওয়ার পর কাফেররা তাঁকে আটক করে। এদিকে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, কাফেররা তাঁকে হত্যা করেছে। নবীজির কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি একটি বাবলা গাছের নিচে বসে সাহাবীদের কাছ থেকে জিহাদের বাইআত নেন। এর আলোচনা কুরআনে করা হয়েছে। এর নাম বাইআতে রিদওয়ান। পরে জানা যায়, এইসংবাদ ভুল ছিল। কুরাইশরা সু হাইল বিন আমরকে সন্ধির আলোচনা করতে পাঠায়। কিছু শর্ত নির্ধারণ করে চুক্তিনামা লেখা হয় এবং ১০ বছরের জন্য সন্ধি হয়ে যায়। সন্ধির শর্তাবলি নিম্নরূপ :

১. ১০ বছর দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ থাকবে।

২. মুসলমানরা এখন উমরা না করেই ফিরে যাবে।

৩. পরের বছর উমরা করতে এসে ৩ দিন অবস্থান করে চলে যাবে।

৪. খাপবদ্ধ তরবারি ছাড়া কোনো অস্ত্র আনা যাবে না।

৫. মক্কার কেউ মুসলমান হয়ে মদীনায় গেলে তাকে ফেরত পাঠাতে হবে। কিন্তু কোনো মুসলমান মক্কায় পালিয়ে এলে কুরাইশরা তাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য নয়।

এ সকল শর্ত মুসলমানদের বিপক্ষে ছিল আর বাহ্যিকভাবে এটি ছিল পরাজয়মূলক সন্ধি। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এর নাম দেন বিজয়। এই সফরেই সূরা ফাতহ নাযিল হয়। ('ফাতহ' অর্থ বিজয়।) এভাবে দমে গিয়ে সন্ধি করাটাকে সাহাবীরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। উমর রা. বারবার নবীজিকে এ কথা বলেন। কিন্তু তিনি বলেন, 'এটি আল্লাহর আদেশ। আর এটি আমাদের ভবিষ্যতের জন্য কল্যাণকর।'
পরবর্তী সময়ের ঘটনাপ্রবাহ দেখলে এ কথার বাস্তবতা বুঝে আসে। এই সন্ধির ফলে মক্কা-মদীনার মধ্যে নিরাপদ যাতায়াত আরম্ভ হয়। কাফেররা মদীনায় মুসলমানদের কাছে যেতে থাকে। ইসলামি শিষ্টাচারের চৌম্বকীয় আকর্ষণ তাদেরকে টানতে থাকে। ঐতিহাসিকদের বক্তব্য হলো, এ সময়ে এত বেশি মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে, যা ইতিপূর্বে কখনো হয়নি। মূলত এই সন্ধি ছিল মক্কা বিজয়ের প্রাথমিক ধাপ।

খালিদ বিন ওয়ালিদ এর ইসলাম গ্রহণ:-

তখন পর্যন্ত মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রতিটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন খালিদ বিন ওয়ালিদ। উহুদ যুদ্ধে তার কৌশলী আক্রমণে কাফেররা যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হয়েছিল। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর নিজে থেকেই মুসলমান হওয়ার জন্য মদীনার পথে রওনা হন। মদীনায় এসে ইসলাম কবুল করেন।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের দাওয়াতি পত্র:-

সন্ধির ফলে যাতায়াতের পথ নিরাপদ হয়ে যায়। তখন নবীজি হকের বাণী পৃথিবীর সকল বাদশাহর কাছে পৌঁছে দিতে চাইলেন।

আমর বিন উমাইয়া রা.-কে হাবাশার সম্রাট আসহামা নাজাশীর কাছে পাঠানো হয়। তিনি নবীজির পত্রকে দুই চোখের ওপর রাখেন এবং সিংহাসন থেকে নেমে মাটিতে বসে পড়েন। এরপর খুশিমনে ইসলাম গ্রহণ করেন। নবীজির জীবদ্দশায় তার মৃত্যু হয়।

সাহাবী দিহয়া কালবী রা.-কে রোমসম্রাট হিরাক্লিয়াসের দরবারে পাঠানো হয়। অকাট্য দলিল ও পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবের সাক্ষ্য দ্বারা তার কাছে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল যে, নবীজি সত্য রাসূল। তাই তিনি ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা করেন। তবে তার ইচ্ছার কথা শুনে দরবারের নেতৃবৃন্দ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তার প্রবল ধারণা হয়, ইসলাম গ্রহণ করলে প্রজারা তাকে ক্ষমতাচ্যুত করবে। এজন্য তিনি বিরত থাকেন।

আবদুল্লাহ বিন হুযাফা রা.-কে ইরানসম্রাট খসরু পারভেজের কাছে পাঠানো হয়। এই হতভাগা নবীজির পত্রের সাথে বেয়াদবি করে। পত্রটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে। নবীজি এই সংবাদ পেয়ে বলেন, 'আল্লাহ তাআলা তার সাম্রাজ্যকে এভাবে খণ্ডবিখণ্ড করুন, যেভাবে সে আমার পত্রকে করেছে।' নবীদের সর্দারের দোয়া কীভাবে বিফলে যাবে! কিছুদিনের মধ্যেই খসরু পারভেজ আপন পুত্র শেরওয়াইহের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়।

হাতিব বিন আবু বালতাআকে মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়ার শাসক মুকাওকিসের কাছে প্রেরণ করা হয়। তার অন্তরেও আল্লাহ তাআলা ইসলামের সত্যতার বিষয়টি ঢেলে দেন। তিনি নবীজির দূতের সাথে অনেক ভালো ব্যবহার করেন। নবীজির জন্য কিছু উপঢৌকন পাঠান। যার মধ্যে মারিয়া কিবতিয়া নামক একজন বাঁদি ছিলেন এবং 'দুলদুল' নামক একটি সাদা খচ্চর ছিল। এক বর্ণনায় আছে, উপহারের মধ্যে এক হাজার দিনার এবং ২০ জোড়া পোশাকও ছিল। আমর বিন আস রা.-কে পাঠানো হয় ওমানের শাসকদ্বয় জাইফার ও আবদুল্লাহ (ইয়ায)-এর কাছে। ব্যক্তিগত গবেষণা ও পূর্ববর্তী কিতাবের মাধ্যমে এ দুজনেরও নবীজির সত্যতার ব্যাপারে বিশ্বাস হয়ে যায় এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করেন। তখনই প্রজাদের থেকে যাকাত আদায় শুরু করেন এবং আমর বিন আসের হাতে তুলে দেন।

খাইবার এর যুদ্ধ :-

মদিনাতে বসবাসকারী বণু নাজির গোত্র আশ্রয় নিয়েছিল খাইবারে। তখন থেকেই ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে বিদ্বেষ দেখাতে শুরু করেন। বনু নাজিরের বিভিন্ন নেতা যেমন সালাম ইবন আবি আল হুকাইক,কিনানা ইবনে আবি আল হুকাইক,হুয়াই ইবন আখতাব প্রমুখ তারাই খাইবারের ইহুদিদেরকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে যুদ্ধ করার জন্য উসকে দেয়।

মুসলমান দের খায়বারের পথে যাত্রা:-

খাইবারের যুদ্ধ সংঘটিত হয় হিজরী সপ্তম বর্ষে। হুদায়বিয়া থেকে ফেরার পর মহররম মাসের শেষভাগে তারা খাইবারের দিকে যাত্রা করে। নবীজির সাথে ছিল বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশ নেয়া ১৪০০ জন সাহাবী। খাইবার ছিল এক বিশাল এলাকা জুড়ে অনেকগুলো দুর্গের সমারোহ।অনেকগুলো দুর্গ থাকার কারণে ইহুদিদের সাথে আগের যুদ্ধগুলোর তুলনায় এই যুদ্ধ জটিল ছিল। নবীজি একে একে সকল দুর্গ জয় করে

সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। শুরু হলো নাঈম দুর্গ দিয়ে। যুদ্ধ শুরু হলো ইহুদিদের এক সাহসী যোদ্ধা বের হয়ে আসলো যার নাম মারহাব। তার সাথে দন্দ্ব যুদ্ধে লিপ্ত হল আমির ইবনে আল আকওয়া রা:। কিছুক্ষণ পর তিনি শহীদ হয়ে গেলে তার জায়গায় আসে আলী রা:। তিনি এসেই মারহাবকে হত্যা করেন। মতান্তরে মারহাবকে হত্যা করে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামাহ রা:।

দশ দিনের মাথায় আলী রা: এ নেতৃত্বে নাঈম দুর্গ জয় হয়। এভাবেই একের পর এক দুর্গ জয় করতে থাকেন।

এই যুদ্ধে আলী রা: অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তিনি একাই খাইবারের দুর্গের ফটক উপরে ফেলেন।

সমগ্র খাইবার বিজয়ের পর ইহুদিরা সন্ধি আলোচনার জন্য নেমে আসে।

সাফিয়া রা : এর সাথে বিয়ে:-

উম্মুল মুমিনীন সাফিয়া রা: এর স্বামী ছিলেন কিনানা বিন আবুল হুকাইক যাকে অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে হত্যা করা হয়েছিল। এবং তার স্ত্রীকে বন্দী করা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়া রা: কে ইসলামের দাওয়াত দেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন তাকে মুক্ত করে নবীজি বিয়ে করেন। নবীজি তাকে ফিরে যাওয়ার প্রস্তাবও দেন কিন্তু তিনি নবীজির স্ত্রী হওয়াকেই পছন্দ করেন।

কাযা উমরাহ পালন :-

এর আগের বছর কাফেরদের বাধা প্রদান করার কারণে ওমরা আদায় করতে পারেননি রসুল ﷺ। হুদায়বিয়ার সন্ধিতে ছিল মুসলমানরা পরের বছর ওমরা করতে আসতে পারবে কিন্তু তিন দিনের বেশি অবস্থান করতে পারবেন না। নবীজি সাহাবীদের নিয়ে ওমরা করতে মক্কায় যান এবং সন্ধির শর্ত মোতাবেক ফিরে আসেন।

মায়মুনা বিনতে হারিস রা : এর সাথে বিবাহ বন্ধন:-

ওমরা পালন করার সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়মুনা বিনতে হারিস রা : কে বিয়ে করেন। মাইমুনা রা: এর স্বামী আবু রাহোম ইবনে আব্দুল উজ্জা মারা যাওয়ার পর তিনি বিধবা হয়ে গিয়েছিলেন। আর দায়িত্ব নেওয়ার মতো মক্কায় কেউ ছিলেন না। এবং এই খবর জানার পর রসুল ﷺ মাইমুনা রা: কে বিয়ে করতে সম্মত হন।

মুতাহ যুদ্ধ ও মুতাহ যুদ্ধের কারণঃ

রাসূলুল্লাহ সাঃ হারিস বিন উমাইর আযদী রাঃ কে বুসরার শাসকের নিকটে দাওয়াতি চিঠি দিয়ে পাঠান। রোম সম্রাটের গভর্নর শুরাহবিল ইবনে আমর গাসসানী রাসূল সাঃ এর দূতকে বন্দি করার পর শক্ত করে বেঁধে হত্যা করে। ওই সময়েসংবাদ বাহকদেরকে হত্যা করা ছিল একটি নিকৃষ্ট অপরাধ এবং যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। রাসূল সাঃ যখন জানতে পারলেন যে, তার পত্রবাহককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে তখন তিনি তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী প্রস্তুত করে যুদ্ধের জন্য রওনা হলেন।

মুসলিম বাহিনীর পরামর্শ সভা:-

মুসলিম বাহিনী মাআন নামক জায়গায় তাবু খাটায়।তারা জানতে পারে যে রোমানরা এক লাখ সৈন্য নিয়ে অবস্থান করছে। শুরাহবিল বিন আমর এর নেতৃত্বে অতিরিক্ত এক লাখ সৈন্য সমবেত হয়েছে। তারা ভাবতে লাগলো ২ লাখ সেনার সাথে মাত্র তিন হাজার সৈন্য নিয়ে তারা মোকাবেলা করবেন কিভাবে। আব্দুল্লাহ বিন রাওআহা রা: সবাইকে মনে করিয়ে দেয় তারা আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করছে। শাহাদত বরণ করার মধ্যে তারা আরো বেশি মর্যাদাবান হবে। তার কথা শুনে সবাই সাহস পায়।

মুখোমুখি সংঘর্ষ :-

মুসলমান বাহিনীর সাথে শত্রুদের মুখোমুখি সংঘর্ষ শুরু হয়। এক পাশে ছিল অস্ত্রে সজ্জিত ৩০০০ মুসলিম সৈন্য আর অন্য পাশে ছিল উন্নত যুদ্ধ সরঞ্জাম সহ রোমান ও মিত্রবাহিনীর ২ লাখ সেনা। জায়েদ বিন হারিসা সর্বপ্রথম যুদ্ধের পতাকা ধারণ করেন এবং অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেন। এক পর্যায়ে তিনি শহীদ হয়ে যান। তারপর সেনাপতির দায়িত্ব নেন জাফর বিন আবিত আলী তিনি যুদ্ধ শুরু করেন। একপর্যায়ে তার ডান হাতটা কাটা পড়ে। তিনি তার বাঁ হাত দিয়ে পতাকা তুলে ধরেন। এরপর তার বাঁ হাতটাও কাঁটা পড়ে। অবশিষ্ট উভয় হাতের অংশ দিয়ে পতাকা বুকে জড়িয়ে ধরে রাখেন। সর্বশেষ তিনি শহীদ হন। এরপর আব্দুল্লাহ বিন রাওাহা রা: পতাকা উঠিয়ে নিয়ে যুদ্ধ শুরু করেন। এবং তিনিও শহীদ হয়ে যান। তিনজন সেনাপতি শহীদ হয়ে যাওয়ার পর সাহাবীগণ খালিদ বিন ওয়ালিদ কে সেনাপতি নির্বাচন করেন। তিনি এই যুদ্ধে নয়টি তলোয়ার ভেঙে ছিলেন এবং ইয়েমেনের তৈরি ছোট্ট একটি তলোয়ার তার কাছে অবশিষ্ট ছিল। এবং খালিদ বিন ওয়ালিদ এর রণকৌশল এর মাধ্যমে ইসলামের ইতিহাসে এই যুদ্ধ স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তারা ধীরে ধীরে পিছিয়ে মদিনাতে ফিরে আসে। এই যুদ্ধে সরাসরি নবীজি অংশ নেননি কিন্তু এই যুদ্ধ এত বিশাল এবং এত বেশি ভয়াবহ ছিল যে একে গাজুওয়া বলে অবহিত করা হয়।

মক্কা বিজয়

অভিযানের কারণ :-

হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল, কেউ যদি চায় তবে মুসলিমদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে পারে। আবার কেউ চাইলেই কুরাইশদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে পারে এবং এই বিষয়ে সকল গোত্রের স্বাধীনতা ছিল। এই শর্তে খুযায়া গোেত্র মুসলিমদের সাথে এবং বনু বকর গোত্র কুরাইশদের সাথে মিত্রতা করে। কিন্তু জাহেলী যুগ থেকেই তাদের মাঝে চলে আসা শত্রুতা কারণে বনু বকর এক পর্যায়ে এই চুক্তি লঙ্ঘন করে ফেলে। ৮ম হিজরীর শাবান মাসে বনু বকরের নওফেল ইবনে মুয়াবিয়া দিলি নামে এক ব্যক্তি কিছু মানুষ নিয়ে রাতের অন্ধকারে বনু খুযাআ গোত্রের উপর আক্রমণ করে বসে। খুজায়া গোত্রের লোকেরা মক্কায় পৌঁছে বুদাইল বিন ওয়ারাকা খুযায়ী এবং নিজেদের মুক্ত করা দাস রাফির ঘরে আশ্রয় নেন। আমর বিন সালিম খুযাই যেখান থেকে বের হয়ে মদিনার দিকে রওনা দেন। এবং রসূলের কাছে এসে তাকে সবকিছু জানান।

কুরাইশদের আতংক:-

কুরাইশ চুক্তি ভঙ্গ করে কিন্তু তাদের মধ্যে এই ভয় কাজ করে যে মুসলমানরা যদি শুনতে পায় তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এর ফলাফল ভালো হবে না। এবং সর্বসম্মতিক্রমে তারা তাদের অঙ্গীকার নবায়ন করার জন্য আবু সুফিয়ানকে মদিনায় পাঠান। তিনি মদিনায় এসে তার কন্যা উম্মে হাবিবার ঘরে পৌঁছান। তাকে দেখে তার কন্যা বিছানা উঠিয়ে ফেলেন এবং তাকে বলেন আপনি অপবিত্র। আর এটি রাসূলের বিছানা তাই অপবিত্র কেউ এখানে বসতে পারেনা। তারপর তিনি রাসুল সা: এর নিকট যায় এবং বিভিন্ন কথা বলেন। নবীজি তার কোন কথার উত্তর দেন না। সাহাবীদের সাথে কথা বলে তিনি বুঝতে পারেন তাদের আর কোন উপায় নেই। কোনভাবেই এই অঙ্গীকার নতুন করে বলবৎ হবেনা।

মক্কা অভিযানে প্রস্তুতি :-

নবীজি অঙ্গীকার ভঙ্গের তিন দিন আগেই আয়েশা রা সফরের জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আবু সুফিয়ান ফিরে যাওয়ার পর রসূল সা: সবাইকে প্রস্তুত হতে নির্দেশ দেন। এরপর অত্যন্ত গোপনে অষ্টম হিজরীতে রমজান মাসে প্রথমভাগে আবু কাতাদাহের নেতৃত্বে ৮ জন মুজাহিদ নিয়ে গঠিত ছোট্ট একটি বাহিনী মদিনা থেকে ৩৬ মাইল দূরে বা তুমি ইজাম নামক স্থানে প্রেরণ করেন। সাধারণ মানুষকে না বুঝতে দেয়ার জন্য এই ব্যবস্থা নেয়া হয়, পরবর্তীতে তারা রাসূলের কাছে মক্কার দিকে রওনা হয়।

এদিকে হাতিব বিন আবি বালতায়া রা: কুরাইশদের নিকট চিঠি লিখে পাঠালেন, নবীজির মক্কা আক্রমণের খবর। তিনি এক মহিলার খোপার মধ্যে করে সেই চিঠি পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার প্রিয় রসূল সা: কে এই খবর জানিয়ে দেন। এবং হযরত আলী রা:, জুবায়ের রা:, মিকদাদ রা: এবং আবু মারসাদ রা: কে সেই চিঠি উদ্ধার করতে পাঠান।

মক্কার দিকে রসুল ﷺ ও তার সেনাগন:-

অষ্টম হিজরীর দশে রমজান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বাহিনী নিয়ে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন। বাহিনীতে ছিল ১০ হাজার সাহাবী। মদিনার প্রশাসনিক দায়িত্ব আবু রুহম কুলসুম ইবনুল হুসাইন আল গিফারী রা: এর উপর দিয়ে যান। পথিমধ্যে নবীজির চাচা আব্বাস রা: ও তার পরিবারের সাথে দেখা হয়। তারা ছিল সর্বশেষ মুহাজির।

রাসূলুল্লাহ সাঃ সফর অব্যাহত রাখেন। এই সফরকালে রাসুলুল্লাহর সাহাবীগণ রোজাদার অবস্থায় ছিলেন। আসফান এবং কুদাইদ নামক জলাশয়ের নিকটে পৌঁছে রাসূল সাঃ এবং সাহাবীগণ রোজা ভঙ্গ করে ফেললেন। এরপর আবার সফর অব্যাহত রাখেন। এভাবে রাত্রির পূর্বভাগ সফর করেন এবং মাররুয যাহরান উপত্যকায় পৌঁছে শিবির স্থাপন করলেন। সেখানে তার নির্দেশক্রমে লোকেরা পৃথক পৃথক আগুন

জ্বালালো। এভাবে ১০,০০০ স্থানে আগুন জ্বালানো হয়। রাসূলুল্লাহ সাঃ হযরত উমার রাঃ কে পাহারার কাজে নিযুক্ত করলেন।এরমধ্যে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু সুফিয়ানকে নবীজির কাছে নিয়ে আসে। এবং আবু সুফিয়ান বুঝতে পারে আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। এবং নবীজির ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করে নেন। মক্কায় প্রবেশের সময় মুহাজির এবং আনসারদের দ্বারা বেষ্টিত নবীজিকে দেখে আবু সুফিয়ান অবাক হয়ে যান। এই জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থা দেখে তিনি বলতে থাকেন এদের সাথে পারবে এমন কেউ নেই। আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বলেন এটাই নবুওয়াত। পদাতিক সৈন্যদের নেতৃত্বে ছিলেন আবু উবাইদা। রাসূল তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তিনি যেন বাতনে ওয়াদির প্রান্তসীমা ধরে অগ্রসর হয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন। এরপর বিভিন্ন বাহিনী তাদের নির্ধারিত স্থানে চলে গেল। খালিদ বিন ওয়ালিদের পথে যেসব পৌত্তলিক এসেছিল তাদের সকলকে হত্যা করা হলো। হযরত খালিদের বন্ধু কুরয বিন জাবির ফাহরি রাঃ এবং খুনাইস বিন খালিদ বিন রবিয়া রাঃ এসময় শাহাদাত বরণ করলেন। এর কারণ ছিল, এই দুইজন সেনাবাহিনী থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে অবস্থান করছিলেন। সেই অবস্থায় তাদের হত্যা করা হয়। খান্দামায় পৌঁছানোর পর খালিদ এবং তার সঙ্গীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে ১২ জন নিহত হয়। এরপর তারা পালিয়ে যায়। হাম্মাস বিন কাইস মুসলিমদের সাথে যুদ্ধের জন্য অস্ত্র ঠিক করে রেখেছিল। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গিয়ে নিজ গৃহে প্রবেশ করল এবং তার স্ত্রীকে বলল, 'দরজা বন্ধ করে দাও'। তার স্ত্রী কথাটি শুনে বলল, 'আপনার সেই বাগাড়ম্বর গেলো কোথায়?' সে বলল, 'হায়রে! তুমি যদি খান্দামায় যুদ্ধের অবস্থা দেখতে তবে এমন কথা বলতে না। তোমাকে কি আর বলবো, সাফওয়ান আর ইকরিমা ছুটে পালালো। নাঙ্গা তলোয়ার দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করা হল। সেই তলোয়ার গলা এবং মাথা এমনভাবে কাটছিল যে, নিহতদের হৃদয়বিদারক চিৎকার এবং হৈহল্লা ছাড়া কিছুই শোনা যাচ্ছিল না'।

মক্কা বিজয় ও নবিজির হারামে প্রবেশ:-

রাসূলুল্লাহ সাঃ তার সামনে ও পেছনে এবং ডানে ও বামে আনসার ও মুহাজির সাহাবীদের পরিবেষ্টিত অবস্থায় অত্যন্ত জাকজমক অথচ বিনয়ের সাথে মসজিদুল হারামে আগমন করলেন। দিনটি ছিল ৮ম হিজরীর ২০ রমযান। মসজিদুল হারামে আগমনের পর সর্বপ্রথম তিনি হাযরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন এবং আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করলেন। তাওয়াফের সময় হাজরে আসওয়াদ অতিক্রমকালে সর্বদা তিনি তাঁর লাঠি/ছড়ি দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করছিলেন। ওই সময়ে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর হাতে একটি ধনুক ছিল | আল্লাহর ঘরের আশেপাশে ও ছাদের উপরে ৩৬০ টি মূর্তি ছিল। রাসূল সাঃ মূর্তিগুলোকে আঘাত করছিলেন। রাসূল সাঃ এর আঘাতে মূর্তিগুলো ভেঙ্গে পড়ছিল। আঘাত করতে করতে তিনি বলছিলেন-

সত্য এসেছে, বাতিল বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় বাতিল বিলুপ্ত হবেই”।

(সূরা ইসরা, ১৭:৮১)

কাবা ঘরের ভিতরে রাসূলুল্লাহ সাঃ এর সালাত আদায় এবং কুরাইশদের উদ্দেশ্যে ভাষণঃ

রসুল সাঃ ভিতর থেকে কাবা ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন। উসামা ও বিলাল ভিতরেই ছিলেন। তিনি দরজার সামনের দেয়ালের অভিমুখী হন এবং দেয়াল থেকে মাত্র তিন হাত দূরত্বে থেমে যান| এই অবস্থায় রাসূল সাঃ এর বাম পাশে দুটি স্তম্ভ, ডান পাশে একটি এবং পিছনে তিনটি স্তম্ভ ছিল। ওই সময়ে কাবা ঘরে ছিল ছয়টি খাম্বা বা খুঁটি। এরপর সেখানে তিনি সালাত আদায় করেন। সালাত আদায় শেষে আল্লাহর ঘরের ভিতরের অংশ তিনি ঘুরে ফিরে দেখতে থাকেন এবং তাওহীদের আয়াতগুলো তিলাওয়াত করতে থাকেন। এরপর পুনরায় কাবা ঘরের দরজা খুলে দেন।রাসূলুল্লাহ সাঃ কী করছেন তা প্রত্যক্ষ করার জন্য বিশাল সংখ্যক কুরাইশ কাবা ঘরের সামনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই সময় দুহাতে দরজার দুই পাল্লা ধরে নিম্নভাগে

দণ্ডায়মান কুরাইশদের সম্বন্ধে রাসূল সাঃ তার ঐতিহাসিক ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন-

“আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি তার অঙ্গীকার পূরণ করে দেখিয়েছেন। তার বান্দাদের সাহায্য করেছেন এবং তিনি এককভাবে সমস্ত দলকে পরাজিত করেছেন। শুনে রাখ, আল্লাহর ঘরের চাবি সংরক্ষণ এবং হাজীদের পানি পান করানোর সম্মান ছাড়া সমস্ত সম্মান অথবা পূর্ণতা অথবা রক্ত প্রবাহিত করা আমার এই দুই পদতলে রইল। ভুলবশত হত্যা যা লাঠি দ্বারা করা হয়ে থাকে তা ইচ্ছেকৃত হত্যা অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তার জন্য রক্তপাতের খেসারত দিতে হবে। অর্থাৎ একশত উট যার মধ্যে চল্লিশটি উট হতে হবে গর্ভবতী।আল্লাহ তা'আলা তোমাদের থেকে জাহেলিয়াতের যুগের অহংকার এবং পূর্বপুরুষদের গৌরব খতম করে দিয়েছেন। সমস্ত মানুষ আদমএর সন্তান এবং তিনি ছিলেন মাটির তৈরি"সালাত এর সময় হলে তিনি বিল্লাল রা: কে আযান দেয়ার নির্দেশ দেন। বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু কাবার ছাদে উঠে আযান দেয়া শুরু করেন। পুরুষ ও নারীরা নবীজির কাছে বাইয়াত গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় ফিরে আসেন।

হুনাইন যুদ্ধ :-

মক্কা বিজয়ের পর পর ইসলাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। আরবেরা দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে চলে আসে। অবশিষ্ট আরবদের ইসলামের বিরোধিতা করার কোন সাহস ছিলনা। তবে হাওয়াযিন, সাকিফ নামক গোত্র অহংকারবশত যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে রওনা দেয়। নবীজির কানে এই খবর আসা মাত্র তিনি ১২ হাজার সৈন্যের সমাবেশ ঘটান। যাদের মধ্যে দশ হাজার ছিল মদিনা থেকে আগত আর দুই হাজার ছিল নওমুসলিম। মুসলমানদের সবচেয়ে বড় বাহিনী ছিল এটা। অষ্টম হিজরীর ৬ শাওয়াল এই বাহিনী রওনা দেয়। হুনাইন নামক পর্বতে শত্রুরা পাহাড়ের ঘাঁটিতে লুকিয়ে ছিল। মুসলমানরা সেখানে পৌঁছানো মাত্র তারা আক্রমণ শুরু করে। অতর্কিত

হামলায় মুসলিম বাহিনী পিছাতে শুরু করে। এই ঘটনার ইঙ্গিত কুরআনে ছিল। সংখ্যাধিক্য ও সাজ সরঞ্জামের কারণে তাদের মধ্যে অহমিকা চলে আসে যা আল্লাহ সুবহানাতায়ালার পছন্দ হয়নি। এবং এই পরিস্থিতি তৈরি করেন যাতে তারা বুঝতে পারে জয় পরাজয় সৈন্য বা যুদ্ধের উপর নির্ভরশীল নয়। রবের উপর তাওয়াক্কুল তাদেরকে সফল করবে।

সেনাদের পিছিয়ে পড়তে দেখে নবীজির আদেশে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু উচ্চস্বরে দৃঢ় থাকার আহবান জানায়।এবং পুনরায় যুদ্ধ করার আদেশ দেন।

এক মুঠো মাটির মুজেযা:-

নবীজি জমিন থেকে এক মুঠো মাটি নিয়ে শত্রুপক্ষের দিকে নিক্ষেপ করেন। আল্লাহর কুদরতে এই মাটি প্রত্যেকের চোখে পৌঁছে যায়। এবং তারা পরাজিত হয়, ভয়ে পালিয়ে যায়।

তাবুক যুদ্ধ :-

নবম হিজরির মধ্যভাগ পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় অবস্থান করেন। এ সময় তিনি সংবাদ পান, মুতা যুদ্ধে পরাজিত রোমানরা তাবুকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ফলে নবীজিও জিহাদের প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করেন। তখন দুর্ভিক্ষের কারণে মুসলমানরা অত্যন্ত নিঃস্ব ও দরিদ্র অবস্থায় ছিলেন। তাছাড়া ওই সময় ছিল তীব্র গরম। এরপরও ইসলামের জন্য প্রাণোৎসর্গকারী সাহাবীরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য চাঁদা তোলা হয়। আবু বকর রা. তাঁর বাড়ির সমস্ত জিনিস এনে দেন। উসমান রা. বিপুল পরিমাণ অনুদান দেন। যার মধ্যে ছিল ৯০০ উট ও ১০০ ঘোড়া।৩ রজব মাসের বৃহস্পতিবার ৩০ হাজার সাহাবীর বাহিনী নিয়ে নবীজি তাবুকের উদ্দেশে রওনা হন।মুসলিম বাহিনী তাবুক পৌঁছে দেখে সেখানে কেউ নেই। হিরাক্লিয়াস ময়দান ছেড়ে চলে গিয়েছে। খালিদ বিন ওয়ালিদকে নবীজি খ্রিস্টান নেতা উকাইদিরের কাছে পাঠান। এবং ভবিষ্যৎবাণী হিসেবে বলে দেন তুমি

রাতের বেলা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, যখন সে শিকারে ব্যস্ত থাকবে। খালিদ বিন ওয়ালিদ রা: সেখানে গিয়ে তাকে ঐ অবস্থাতেই পায় এবং তাকে ধরে নবীজির কাছে নিয়ে আসে। মুসলিম বাহিনী সেখানে প্রায় ১৫ থেকে ২০ দিন অপেক্ষা করে কিন্তু কেউ আসেনা। রমজান মাসে তারা মদিনায় ফিরে আসে।

মসজিদে যিরারে অগ্নিসংযোগ:-

মদীনায় ফিরে আসার পর নবীজি ওই স্থান আগুনে পুড়িয়ে দেওয়ার আদেশ দেন, যেখানে বসে মুনাফিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরামর্শ করত। মুসলমানদের ধোঁকা দিতে তারা এর নাম দিয়েছিল মসজিদ।বোঝা গেল, মসজিদে যিরার মূলত মসজিদ ছিল না।

প্রতিনিধিদলের আগমন এবং দলে দলে ইসলাম গ্রহণ:-

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর যখন রাস্তা নিরাপদ হয়ে যায়, তখন বিস্তৃত আকারে ইসলাম প্রচার-প্রসার লাভ করে। এজন্য আকাশের খাতায় এই সন্ধির নাম রাখা হয়েছে 'বিজয়'। এরপরও কিছু লোক কুরাইশদের ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে পারছিল না। মক্কা বিজয়ের পর এই সমস্যাও কেটে যায়। তখন তারা ইসলাম এর ছায়ায় চলে আসে।

প্রতিনিধি দল সমুহ:-

১.সাকিফ গোত্রের প্রতিনিধি দল

২.বনু ফাজারার প্রতিনিধি দল

৩. বনু তামিমের প্রতিনিধি দল

৪. বনু সাদ বিন বকরের প্রতিনিধি দল

৫.কিন্দার প্রতিনিধি দল

৬.বনু আব্দে কায়েস এর দল

৭.বনু হানিফার প্রতিনিধি দল।

এরকম আরো বহু প্রতিনিধি দল নিয়মিত আসতে থাকে। যার সংখ্যা ৭০ টির মত।

বিদায় হজ

রসুল ﷺ বুঝতে পারছিলেন যে দুনিয়ায় তার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। যে শির্কের অস্তিত্ব মুছে ফেলার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে পাঠিয়েছিলেন, তার প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কেয়ামত পর্যন্ত এই মিশন চালিয়ে যাওয়ার জন্য তার অনুসারীদের তিনি নির্দেশ দিয়ে যাবেন। আল্লাহ সুবহানাতায়ালা তার হাবিবকে দুনিয়ার বুক থেকে নিয়ে যাবেন।

জিলকদ মাসের চার দিন বাকি থাকতে ইবনে ইসহাকের মতে দিনটি ছিল ২৫ শে জুল কাদাহ, শনিবার। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার দিকে যাত্রার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন।তিনি চুলের তেল ব্যবহার করলেন, পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করলেন, কোরবানির পশুকে সুসজ্জিত করলেন এবং যোহরের সালাত আদায় করে রওনা হলেন।

জোহরের সালাতের পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করলেন। আয়েশা রা: রাসূলুল্লাহর শরীরে এবং মাথায় নিজ হাতে মালিশ করে দিলেন। এরপর তিনি লুঙ্গি পরিধান করলেন, চাদর গায়ে দিলেন এবং যোহরের দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন।তারপর তিনি একই সাথে ওমরা ও হজের তালবিয়া উচ্চারণ করলেন। বাইরে এসে উটের উপর আরোহন করলেন। ফাঁকা ময়দানে এসে উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করলেন। দিনটি ছিল দশম হিজরীর ৪ঠা জিলহজ রবিবার। মসজিদুল হারামে পৌঁছে আল্লাহর নবী সা: কাবাঘর তাওয়াফ করেন এরপর তিনি মাকামে ইব্রাহিমকে সামনে রেখে দুই রাকাত সালাত আদায় করেন এবং পুনরায় হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন।

৮ই যিলহাজ্ব রাসুল সাঃ মিনায় গেলেন। সেখানে ৯ই যিলহজ্জ তারিখ সকাল পর্যন্ত অবস্থান করলেন। সেখানে যোহর, আসর, মাগরিব, এশা এবং ফজরের পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করলেন। এরপর সূর্যোদয়ের পরে আরাফার দিকে রওনা হয়ে গেলেন। সেখানে পৌঁছে নামিরা প্রান্তরে তাবু স্থাপন করলেন। সেখানেই সূর্যাস্তের পরে রাসুল

সাঃ এর কাসওয়া নামক উটের পিঠে হাওদা চাপানো হলো। তিনি বাত্বনে ওয়াদিতে চলে গেলেন। ওই সময়ে রাসুল সাঃ এর সাথে ছিলেন ১,২৪,০০০ কিংবা ১,৪৪,০০০ জনতার ঢল। এই বিশাল জনতার উদ্দেশে তিনি এক ঐতিহাসিক, মর্মস্পর্শী এবং কালজয়ী ভাষণ প্রদান করলেন। সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করে তিনি বললেনঃ

'লোকেরা, তোমরা মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোনো! হয়তো আজকের পর আমি আর কখনো এখানে তোমাদের সঙ্গে একত্রিত হতে পারবো না। আজকের এই দিন, এই মাস ও এই শহর যেমন পবিত্র; তোমাদের জান, মাল, ইজ্জত কিয়ামত পর্যন্ত তেমনই পবিত্র। কারো কাছে যদি কোনো আমানত রক্ষিত থাকে, তাহলে সে যেন তা আমানতকারীর কাছে পৌঁছে দেয়। তোমরা অন্যের ওপর অত্যাচার করবে না, নিজেরাও অত্যাচারিত হবে না।

জেনে রেখো, জাহিলী যুগের সকল অপসংস্কৃতি আমার পায়ের নিচে। শুধু কাবাঘরের তত্ত্বাবধান ও হাজীদের পানি পান করানো ছাড়া। জাহিলিয়াতের সকল রক্তপণের দাবি বাতিল করা হলো। প্রথম যে রক্তপণের দাবি বাতিল করছি, তা হলো রবিয়া ইবন হারিস ইবন আবদুল মুত্তালিবের রক্ত। সে শিশু অবস্থায় বনু সাদের দুগ্ধপোষ্য ছিল, তখন হুযায়ল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে। জাহেলী যুগের সুদের প্রথা বিলুপ্ত করা হলো। তোমাদের কেবল মূলধনের ওপর অধিকার থাকলো। সর্বপ্রথম যে সুদ বাতিল করছি, তা হলো আমাদের বংশের আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিবের সুদ। তার সমস্ত সুদ বাতিল করা হলো। নারীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নারীদের উপর যেমন পুরুষদের অধিকার রয়েছে, তেমনি পুরুষদের উপর রয়েছে নারীদের অধিকার। তোমরা তাদের আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর নির্ধারিত কালিমা বাক্যের মাধ্যমে তাদের লজ্জাস্থান নিজেদের জন্য হালাল করেছো। তাদের উপরে তোমাদের অধিকার এই যে, তোমরা অপছন্দ করো এমন কাউকে ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেবে না। যদি তারা এরূপ করে, তবে হালকাভাবে প্রহার কর।

আর তোমাদের উপর তাদের অধিকার হলো, তোমরা তাদের ভরণ-পোষণ ও পোশাক-পরিচ্ছেদের ভার বহন করবে ন্যায়সঙ্গতভাবে।

আমার পর তোমরা পরস্পর খুনোখুনিতে জড়িয়ে কুফরে পতিত হয়ো না। যারা সালাত আদায় করবে, তারা (পুনরায়) শয়তানের ইবাদাত করবে, এটা শয়তান আশা করে না। কিন্তু সে তোমাদের মধ্যে বিবাদ করতে থাকবে। তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে। যদি বিকলাঙ্গ কোনো দাসও তোমাদের উপর নেতা নিযুক্ত হয় এবং সে তোমাদের আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী নেতৃত্ব দেয়, তাহলে তাঁকে শুনবে ও মানবে। সাবধান! অপরাধী তার অপরাধের জন্য নিজেই দায়ী। সাবধান! পিতার অপরাধ সন্তানের ওপর বর্তায় না, না বর্তায় সন্তানের অপরাধ পিতার ওপরে। জেনে রেখো, এ নগরে আর কখনো শয়তানের ইবাদাত হবে না, এ থেকে সে নিরাশ হয়ে গেছে। তবে তুচ্ছ ভেবে এমন অনেক কাজ তোমরা করবে, যা করলে সে খুশি হবে। তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করবে, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, রামাদান মাসে সিয়াম পালন করবে, যাকাত আদায় করবে ও তোমাদের নেতার আদেশ মেনে চলবে, তবে তোমরা জান্নাত লাভ করবে। তোমাদের গোলাম ও অধীনস্থদের বিষয়ে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। তোমরা যা খাবে, তাদেরকে তা খেতে দেবে। তোমরা যা পরবে তাদেরকেও সেভাবে পরতে দেবে।জেনে রেখো, এক মুসলিম আরেক মুসলিমের ভাই। তোমাদের একের সম্পদ আরেকজনের জন্য বৈধ নয়। তবে কেউ স্বেচ্ছায়, খুশি মনে তার সম্পদ কাউকে দিয়ে দিলে সেটা ভিন্ন কথা। কাজেই নিজেরা নিজেদের ওপর জুলুম কোরো না।আল্লাহ তাআলা তোমাদের সম্পদের মিরাস নির্দিষ্টভাবে বণ্টন করে দিয়েছেন। তার থেকে কম বেশি করবে না। সম্পদের তিন ভাগের এক ভাগের চেয়ে অতিরিক্ত কোনো অসিয়ত বৈধ নয়। সন্তান যার বিছানায় জন্ম গ্রহণ করবে, সে তারই হবে। ব্যভিচারের শাস্তি হচ্ছে প্রস্তরাঘাত। (অর্থাৎ সন্তানের জন্য শর্ত হলো তা বিবাহিত দম্পতির হতে হবে। ব্যভিচারীর সন্তানের অধিকার নেই)। যে সন্তান আপন পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা এবং যে দাস নিজের মালিক ব্যতীত অন্য কাউকে মালিক বলে স্বীকার করে, তাদের উপর আল্লাহ তাআলা, ফেরেশতাকুল এবং সমগ্র মানব জাতির অভিশাপ। নিশ্চয়ই

তোমাদের রব এক, তোমাদের পিতা এক। আরবের ওপর অনারবের এবং অনারবের ওপর আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, সাদার উপর কালোর আর কালোর উপর সাদার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হবে কেবল তাকওয়ার মাপকাঠিতে। মনে রেখো, সকলকে একদিন আল্লাহ তাআলার সামনে হাজির হতে হবে। সে দিন তিনি প্রতিটি কাজের হিসাব গ্রহণ করবেন। তোমরা আমার পরে গোমরাহিতে লিপ্ত হবে না, পরস্পর হানাহানিতে মেতে উঠবে না। আমি শেষ নবী, আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না। আমার মাধ্যমে ওয়াহীর পরিসমাপ্তি হতে যাচ্ছে। আমি তোমাদের জন্য দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা এই দুটি বস্তু আঁকড়ে থাকবে, ততদিন তোমরা নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহর কিতাব ও অপরটি রাসূলের সুন্নাহ। প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে আমার কথাগুলো পৌঁছিয়ে দেয়। হতে পারে, যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে এমন অনেকে থাকবে যারা উপস্থিত শ্রোতার চাইতে আমার কথাগুলো ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারবে।'

খুতবা শেষে আল্লাহর রাসূল সাহাবিদের জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদেরকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা তখন কী বলবে?

সাহাবিরা উত্তর দিলেন, 'আমরা সাক্ষ্য দেবো, নিশ্চয়ই আপনি আপনার বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন, দায়িত্ব পালন করেছেন এবং আমাদের আন্তরিক উপদেশ দিয়েছেন।" এরপর আল্লাহর রাসূল আকাশের দিকে আঙুল তুললেন, এরপর আবার মানুষের দিকে আঙুল দেখালেন, এরকম কয়েকবার করলেন আর বলতে থাকলেন,

'হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো! হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো! হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো!'

আল্লাহর রাসূল সা: দুআ

বিদায় হজ্জের আলোচনার উপসংহার হিসাবে যোগ্য আল্লাহর রাসূলের এই দু'আটি। শাইখ আবুল হাসান আন-নাদভী তাঁর আস-সীরাহ আন-নববী গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন,

'হে আল্লাহ! তুমি নিশ্চয়ই আমার কথাগুলো শুনেছো, দেখেছো আমি কোথায় আছি। তুমি আমার অন্তরের খবর জানো, তুমি আমার বাহ্যিক অবস্থাও জানো, আমার কিছুই তোমার কাছে গোপন নয়। আমি অসহায়, দুর্বল। আমি তোমার কাছে সাহায্য চাই, তোমার কাছে আশ্রয় চাই। আমি তোমার শাস্তির আশঙ্কা করি, ভয় করি। আমি নিজের সমস্ত দোষ তোমার কাছে স্বীকার করে নিচ্ছি। এক অসহায় বান্দা হিসেবে আমি তোমার কাছে সাহায্য চাই, গুনাহগার হিসেবে আমি তোমার কাছে তাওবা করি। একজন ভীতসন্ত্রস্ত মানুষ হয়ে আমি তোমার কাছে মিনতি করছি, নিজেকে সঁপে দিয়ে তোমার কাছে মিনতি করছি, অঝোরে কেঁদে তোমার কাছে মিনতি করছি, বিনম্র হয়ে তোমার কাছে মিনতি করছি। ও আল্লাহ! ও আমার রব! তুমি আমার এই মিনতি কবুল করে আমাকে সন্তুষ্ট করো। আমার প্রতি দয়া করো, করুণা করো! তুমিই তো শ্রেষ্ঠ দুআ শ্রবণকারী, তুমিই তো শ্রেষ্ঠ দাতা!'

সারিয়্যায়ে উসামাঃ-

মক্কা থেকে ফিরে আসার পর একাদশ হিজরির ২৬ সফর সোমবার রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য একটি বাহিনী প্রস্তুত করেন। এতে আবু বকর, উমর ও আবু উবাইদা রা.-এর মতো বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। তবে এই সারিয়্যার আমির নির্ধারণ করেন উসামা বিন যায়দ রা.-কে। এটি ছিল নবীজি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত শেষ বাহিনী। এই বাহিনী রওনা হওয়ার আগেই নবীজি জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়েন।

জীবনের শেষ সময়ে দুনিয়ার বাদশাহ

সূরা নাসরে আল্লাহর রাসূল সা: জীবনবসানের ইংগিত আছে। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস একজন তরুণ সাহাবি, কিন্তু তিনি বয়স্ক মুহাজির ও আনসারদের সাথে উমার ইবন খাত্তাবের দরবারে বসতেন। এত কমবয়স্ক একজন সাহাবির উপস্থিতিতে প্রবীণ মুহাজির এবং আনসাররা কিছুটা অস্বস্তি বোধ করতেন, তারা একদিন বললেন, 'এই যুবক আমাদের সাথে কেন বসছে?' উমার তাদের প্রশ্নের জবাবটা একটু ঘুরিয়ে দিলেন, বললেন, 'আচ্ছা, সূরা নাসর থেকে আপনারা কে কী বোঝেন?' সবাই নিজ নিজ ব্যাখ্যা দিল। উমার এরপর ইবন আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এই সূরা থেকে কী বোঝো?' ইবন আব্বাস বললেন, 'আমি এই সূরা থেকে রাসূলুল্লাহর মৃত্যুর ব্যাপারে ইঙ্গিত পাই।' উমার বললেন, 'আর আমিও তা-ই বুঝি।' এর মাধ্যমে উমার উপস্থিত সাহাবিদের বুঝিয়ে দিলেন যে, ইবন আব্বাসের বয়স কম হতে পারে, কিন্তু কুরআনের বিষয়ে তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কারণে তিনি উমারের দরবারে অন্য প্রবীণ সাহাবিদের সাথে স্থান পেয়েছেন। সাধারণত কোনো কাজ শেষ করার পর আল্লাহ আযযা ওয়া জালের কাছে ইসতিগফার করা হয়। এই সূরায় আল্লাহ বলছেন, যখন আল্লাহর দ্বীনের বিজয় আসবে, মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহর রাসূল যেন ইসতিগফার করেন। এই ইসতিগফার তাঁর দাওয়াহ মিশনের সমাপ্তির দিকে ইঙ্গিত করে।

আল্লাহর রাসূলের মৃত্যুর দিকে ইঙ্গিত করে এমন বেশ কিছু হাদীস রয়েছে। রাসূলুল্লাহ মুআয ইবন জাবালকে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় বলেন, 'তোমার সাথে হয়তো আমার আর দেখা হবে না।' এ কথা শুনে মুআয কাঁদতে থাকেন। অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ বলেছেন, 'আমার কাছ থেকে হজ্জের নিয়ম শিখে নিও, কেননা এই বারের পর হয়ত আমি আর কখনো হজ্জ করতে পারবো না।' আরও একটি হাদীস আছে সহীহ বুখারিতে, সেটি বর্ণনা করেছেন আইশা। তিনি বলেন,

একবার আমরা নবীজির সব স্ত্রী একসাথে বসে আছি, এমন সময় ফাতিমা পায়ে হেঁটে আসছিলেন। আল্লাহর কসম। তাঁর হাঁটা যেন অবিকল রাসূলুল্লাহর হাঁটার মতো ছিল। মেয়েকে দেখে নবীজি স্বাগত জানালেন, বললেন, 'আমার মেয়ের আগমন শুভ হোক।' তারপর তাঁকে নিজের পাশে বসালেন। এরপর ফাতিমাকে কানে-কানে কিছু একটা বললেন, আর ফাতিমা খুব করে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর অস্থিরতা দেখে দ্বিতীয়বার তাঁর কানে-কানে কিছু একটা বললেন। তখন ফাতিমা হাসতে লাগলেন!

নবীজির স্ত্রীদের মধ্য থেকে আমি বলে উঠলাম, আমাদের উপস্থিতিতে আল্লাহর রাসূল সবার মাঝে আলাদা করে তোমাকে গোপনে একটা কথা বলেছেন, আর তুমি কাঁদছো! এরপর যখন নবীজি উঠে চলে গেলেন, তখন আমি ফাতিমাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আচ্ছা, উনি তোমাকে কানে-কানে কী বলেছিলেন? ফাতিমা বললেন, আমি রাসূলুল্লাহর গোপন কথা ফাঁস করবো না। এরপর যখন রাসূলুল্লাহর মৃত্যু হলো, আমি তাঁকে বললাম, তোমার ওপর আমার দাবি থেকে জানতে চাই, তুমি কি আমাকে তাঁর গোপন কথাটি বলবে না? ফাতিমা বললেন, হ্যাঁ, এখন তোমাকে জানাবো। প্রথমবার তিনি আমাকে গোপনে বলেছিলেন, জিবরীল প্রতি বছর এসে পূর্ণ কুরআন একবার আমার নিকট পেশ করতেন। কিন্তু এ বছর তিনি এসে তা আমার কাছে দু'বার পেশ করেছেন। এতে আমি ধারণা করছি যে, আমার চির বিদায়ের সময় চলে এসেছে। সুতরাং তুমি আল্লাহকে ভয় করে চলবে আর বিপদে ধৈর্যধারণ করবে। নিশ্চয়ই আমি তোমার জন্য উত্তম অগ্রগামী। তখন আমি কাঁদতে থাকি, যা তুমি নিজেই দেখেছো। আর এরপর অস্থিরতা দেখে আমাকে দ্বিতীয়বার কানে-কানে বললেন, ফাতিমা, তুমি কি এটা পছন্দ করো না যে তুমি মু'মিন নারীদের সর্দার হবে অথবা এই উম্মতের নারীদের সর্দার হবে? তখন আমি হেসে দিলাম, সেটাও তুমি দেখেছো। '

সে বছর সফর মাসের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ একদিন মাঝরাতে আবু মুওয়াইহিবাকে ডেকে বললেন, 'আবু মুওয়াইহিবা, আমাকে বাক্বী'র অধিবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য আদেশ করা হয়েছে। চলো আমার সাথে।' আবু মুওয়াইহিবা ছিলেন আল্লাহর

রাসূলের আযাদকৃত দাস। আল বাক্বী' হলো মদীনার কবরস্থান। সেখানে সমাহিত করা হয়েছে সেইসব সাহাবিদের যারা রাসূলুল্লাহর সাথে কষ্ট করেছেন, যুদ্ধ করেছেন, ইসলামের জন্য জান দিয়েছেন। গভীর রাত। রাসূলুল্লাহ বাক্বীতে গেলেন,

'হে কবরবাসী, তোমাদের প্রতি সালাম। তোমরা যে অবস্থায় আছো, সেটা জীবিতদের চাইতে ভালো। তোমরা সুখী হও। আঁধার রাতের মতো ধেয়ে আসছে ফিতনা-ফাসাদ-একটার পেছনে আরেকটা, আর প্রথমটার চাইতে পরেরটা ভয়াবহ।'

এরপর রাসূলুল্লাহ আবু মুওয়াইহিবার দিকে তাকালেন। বললেন, 'আমাকে এই দুই এর মাঝে একটি বাছাই করতে বলা হয়েছিল, হয় আমি দুনিয়ার সমস্ত রত্নভাণ্ডার আর সম্পদের চাবি নিয়ে শেষ পর্যন্ত থাকবো। এরপর জান্নাতে যাবো। অথবা আমার রবের সাথে সাক্ষাৎ এবং জান্নাত।'

আবু মুওয়াইহিবা বললেন, 'আমার পিতামাতা আপনার প্রতি কুরবান হোক। আপনি দুনিয়ার রত্নভাণ্ডার, শেষপর্যন্ত দুনিয়াতে থেকে তারপর জান্নাত সুযোগটাই বেছে নিন!' রাসূলুল্লাহ বললেন, 'না, আল্লাহর কসম, আমি আমার রবের সাথে মিলিত হওয়া এবং জান্নাতকেই বেছে নিয়েছি।'

তিনি দুনিয়ার বাদশাহ ছিলেন কিন্তু তার চাওয়া এবং পাওয়া দুনিয়া থেকে কিছুই ছিল না। তিনি এক অন্য রকম নেতা ছিল। যার কোন অহমিকা ছিল না, কোন চাহিদা ছিল না, ছিল না কোন সহায় সম্পদ। আরাম আয়েশ বলে তার জীবনে কিছুই ছিল না।

আবু বকরের ইমামতি:-

আয়েশা রা. বলেন, রাসুল রোগাক্রান্ত থাকাকালে একবার বিলাল রা. তাঁর কাছে এসে সালাতের (সময় হওয়ার) সংবাদ দেন। রাসুল বলেন, 'আবু বকরকে বলো, যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেন।' আমি বললাম, 'আবু বকর রা. কোমল হৃদয়ের লোক। তিনি আপনার স্থানে দাঁড়ালে কেঁদে ফেলবেন, কিরাআত পড়তে পারবেন না।' কিন্তু তিনি আবার বললেন, 'আবু বকরকে সালাত আদায় করতে বলো।' আমি এবারও সে কথা বললাম। তৃতীয় বা চতুর্থবারে রাসুল বললেন, 'তোমরা তো ইউসুফ আ.-এর

সময়ের রমণীদেরই মতো। আবু বকরকে বলো, তিনি যেন লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করেন।' আবু বকর রা. লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে রাসুল দুজন লোকের কাঁধে ভর করে বের হন। আয়েশা রা. বলেন, আমি যেন এখনো সে দৃশ্য দেখতে পাই। তিনি দু-পা মাটির উপর দিয়ে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। আবু বকর রা. তাঁকে দেখতে পেয়ে পেছনে সরে আসছিলেন। রাসুল ইঙ্গিতে তাঁকে তাঁর স্থানে সালাত আদায় করতে বলেন;

তারপর নবিজিকে আবু বকরের পাশে আনা হয়। নবি তাঁর পাশে বসেন।

(হাদিসের বর্ণনাকারী) আমাশকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহলে কি রাসুল ইমামতি করছিলেন, আবু বকর রা. তাঁর মুক্তাদি হয়ে সালাত আদায় করছিলেন; আর অবশিষ্টরা আবু বকরের ইকতিদা করে সালাত আদায় করছিল? তিনি উত্তর দেন, হ্যাঁ।

শেষ সময় আল্লাহ এর নবীর:-

আবু বকর রা: মুসলিমদের নিয়মিত সালাত পড়াতে থাকেন। সোমবার দিন সবাই ফযরের সালাত এ দাড়ান। সাহাবিগণ বলেন, রাসুল আয়েশার কক্ষের পর্দা উত্তোলন করে আমাদের দিকে দেখছিলেন। রাসুল দাঁড়ানো অবস্থায় ছিলেন এবং তাঁর চেহারা ছিল সাদা কাগজের মতো উজ্জ্বল। তিনি মুচকি হাসেন। আমরা আনন্দের আতিশয্যে যেন সালাত ছেড়ে দেওয়ার উপক্রম হচ্ছিলাম। আমরা মনে করছিলাম, হয়তো রাসুল সালাতে আসবেন; কিন্তু তিনি আমাদের হাতের ইশারায় বুঝিয়ে দেন যে, তোমরা তোমাদের সালাত পূর্ণ করো এবং তিনি পুনরায় কক্ষে ফিরে যান। তাঁর কক্ষের পর্দা আবার ঝুলিয়ে দেওয়া হয় এবং সাহাবিগণ নিজেদের কাজে ফিরে যান।ধীরে ধীরে রাসুলের মৃত্যুযন্ত্রণা তীব্র হচ্ছিল। ইতিমধ্যে তাঁর কাছে উসামা ইবনু জায়েদ প্রবেশ করেন। রাসুল তখন কথা বলতে পারছিলেন না; তবে হাত আকাশের দিকে উঁচু করে উসামার ওপর রাখেন, যেন তিনি তাঁর জন্য দুআ করছেন। এরপর রাসুলের স্ত্রী সাইয়িদা আয়েশা রাসুল-কে তাঁর কোলে তুলে নেন। আবদুর রহমান ইবনু আবি বকর

হাতে একটি মিসওয়াক নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলে রাসুল সেদিকে বার বার তাকাচ্ছিলেন। আয়েশা রা. বললেন, 'আমি কি আপনার জন্য তা নেব?' রাসুল ইতিবাচক ইঙ্গিত করলে আয়েশা রা. ভাইয়ের হাত থেকে মিসওয়াক নিয়ে চিবিয়ে তা কিছুটা নরম করে রাসুলের হাতে দেন। রাসুল মিসওয়াক করেন। তা দিয়ে অত্যন্ত সুন্দরভাবে

এতকিছুর মধ্যেও তাঁর মুখ থেকে বের হচ্ছিল في الرفيق الأعلى প্রিয় বন্ধুর সান্নিধ্যে। তাঁর পাশে রাখা একটি পানির পাত্রে বার বার হাত প্রবেশ করাচ্ছিলেন এবং সেখান থেকে পানি নিয়ে নিজের মুখমণ্ডল মাসেহ করছিলেন আর বলছিলেন,

আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। নিশ্চয় প্রতিটি মৃত্যুরই যন্ত্রণা রয়েছে।

এরপর তিনি হাত উপরের দিকে তুলে বলতে থাকেন, في الرفيق الأعلى আর এই অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। হাত এক দিকে ঝুলে পড়ে। অন্য বর্ণনায় আছে, রাসুল তখনো বলছিলেন,

اللهمَّ أَعِنِّي عَلَى سَكَرَاتِ المَوْت

হে আল্লাহ, আমাকে মৃত্যুযন্ত্রণায় সহযোগিতা করুন। অন্য বর্ণনায় আছে, আয়েশা রা. বলেন, আমি রাসুলের মৃত্যুপূর্ব সময়ে তাঁর মুখের কাছে ঝুঁকেছিলাম। তিনি তখন বলছিলেন,

اللهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي وَالْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الأعلى

হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে দয়া করুন এবং আমাকে মহান বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দিন।এক বর্ণনায় আছে, রাসুলের মৃত্যুযন্ত্রণা দেখে ফাতিমা রা. বলছিলেন, 'আহ! আমার পিতার কষ্ট!' রাসুল তাঁকে বলেন, 'তোমার পিতার আজকের দিনের পর আর কোনো কষ্ট হবে না।' রাসুলের ইনতিকালের পর ফাতিমা রা. বলেন, 'হে আমার পিতা, আপনি আপনার প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়েছেন। হে আমার পিতা, যাঁর বাসস্থান হবে জান্নাতুল ফিরদাউস। হে আমার পিতা, আমরা জিবরিলের মাধ্যমে আপনার শোকগাথা পেশ করব।'

রাসুল-কে যখন দাফন করা হয়, তখন তাঁর কন্যা ফাতিমা রা. বলেন, 'হে মানুষজন, তোমাদের আত্মা কীভাবে সংবরণ করেছ যে, তোমরা আল্লাহর রাসুলের উপর মাটি দিয়ে ঢেকে দিচ্ছ?

দুনিয়ার বাদশাহ বিদায় নিলেন। সহি বুখারী অনুযায়ী তার বয়স ছিল ৬৩ বছর।

সীমাহীন দুঃখ :-

এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে মদীনাবাসী স্তব্ধ হয়ে গেল। পুরা দুনিয়া অন্ধকার হয়ে গেল। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

রাসুলুল্লাহ যেদিন আমাদের নিকট আগমন করেছিলেন সেদিনের মত উজ্জ্বলতম দিন আর কখনো দেখিনি এবং যেদিন তিনি মৃত্যুবরণ করলেন সেদিনের মত এত নিকৃষ্ট এবং অন্ধকার দিন আর কখনো দেখিনি।

উমরা রা: এর অবস্থা:-

রসুল ﷺ এর মৃত্যু সংবাদ শোনার সাথে সাথে উমার রা:এর হুশ বুদ্ধি লোপ পেতে থাকে। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করেন, কিছু সংখ্যক মুনাফিক মনে করেছে যে, রাসূলুল্লাহ সা: মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে তিনি মৃত্যুবরণ করেন নি, বরং আপন প্রতিপালকের নিকট গমন করেছেন। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ সা: ও অবশ্যই ফিরে আসবেন এবং ঐ সকল লোকের হাত পা কেটে দেবেনযারা মনে করে যে প্রকৃতই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

আবু বকর রা: এর সিদ্ধান্ত :-

রসুলের ইনতিকালের সংবাদ যখন আবু বকর রা.-এর গোচরীভূত হয়, তিনি তাৎক্ষণিক ঘোড়ায় আরোহণ করে সুনাহ থেকে ফিরে আসেন। মসজিদে নববির সামনে অবতরণ করে কারও সঙ্গে কথা না বলে আয়েশা সিদ্দিকার কক্ষের দিকে এগিয়ে যান। কক্ষে প্রবেশ করে রাসুলের চেহারা কাপড় দিয়ে আবৃত করে রাখা অবস্থায় দেখতে পান।

তিনি রাসুলের চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে একটু ঝুঁকে গিয়ে মুখে চুমু খান এবং কেঁদে ওঠেন। এরপর বলেন, 'আল্লাহর রাসুল, আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক! নিশ্চয় আল্লাহ আপনার জন্য দুটি মৃত্যু একত্র করবেন না। আপনার জন্য যে মৃত্যু নির্ধারিত ছিল, আপনি তা বরণ করেছেন।

আবু বকর রা. বেরিয়ে উমর রা.-এর সঙ্গে কথা বলেন। বলেন, 'উমর, তুমি বসে যাও।' উমর তখনো রাগান্বিত অবস্থায় নিজের কথা বলে যাচ্ছিলেন। তখন আবু বকর রা. মানুষের সামনে বক্তব্য দিতে দাঁড়িয়ে যান। আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন

করার পর বলেন, 'নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে যে মুহাম্মাদের ইবাদত করত, সে যেন এ কথা জেনে নেয় যে, মুহাম্মাদ ইনতিকাল করেছেন। আর যে আল্লাহর ইবাদত করত, সে যেন এ কথা স্মরণ রাখে, নিশ্চয় আল্লাহ চিরঞ্জীব, তিনি কখনো ইনতিকাল করবেন না।' এরপর তিনি তিলাওয়াত করেন।

আর মুহাম্মাদ একজন রাসুল মাত্র; তাঁর পূর্বেও বহু রাসুল গত হয়েছেন। তাহলে তিনি যদি মারা যান; অথবা নিহত হন, তবে তোমরা কি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে? বস্তুত কেউ যদি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না; আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সাওয়াব দান করবেন। [সুরা আলে ইমরান: ১৪৪]

উমর রা. বলেন, আল্লাহর শপথ, যখন আবু বকর রা. এই আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন, আমি স্থির থাকতে পারছিলাম না। আমার পা আমার শরীরের ভার বহন করতে পারছিল না। আমি এ আয়াত শোনামাত্রই তাৎক্ষণিক মাটিতে বসে পড়ি। তখন মনে হচ্ছিল সত্যিই রাসুল ইনতিকাল করেছেন।

খলিফা নির্বাচন ও কাফন-দাফনঃ

রাসুলের কাফন দাফনের পূর্বে রাসুলের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ব্যাপারে মুসলিমদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হলো। সাকীফা বনু সাঈদায় মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে আলোচনা চলতে লাগল। অবশেষে আবু বকর রাঃ এর খিলাফতের ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হল এবং রাত চলে আসলো। এই অবস্থায় সোমবার দিবাগত রাত অতিবাহিত হলো, মঙ্গলবার সকাল চলে আসলো। এই সময় পর্যন্ত রাসুলের দেহ একটি চাদরে আবৃত অবস্থায় ছিল। ঘরের মানুষেরা ভেতর থেকে দরজা বন্ধ রেখেছিল। মঙ্গলবার দিন রাসূলকে কাপড়সহ গোসল দেয়া হলো। গোসল দেওয়ার কাজে অংশ নিলেন হযরত আব্বাস, হযরত আলী, হযরত আব্বাসের দুই পুত্র ফযল ও কুসাম এবং রাসুলের আজাদকৃত দাস শুরুরান, হযরত উসামা বিন যায়েদ ও আওস ইবনে খাওলা রাঃ। হযরত আব্বাস ও তাঁর দুই পুত্র রাসূলের পাশ পরিবর্তন করে দিচ্ছিলেন। হযরত উসামা ও হযরত শাকরান পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন এবং হযরত আলী রাঃ রাসূল সাঃ কে গোসল করিয়ে দিচ্ছিলেন। রাসূলের দেহ মোবারককে নিজ বুকের উপর ভর করে নিয়ে রেখেছিলেন হযরত আউস রাঃ।

রাসূলকে তিনবার বরইপাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল দেয়ানো হয়। কুবায় অবস্থিত সাদ বিন খায়সামা রাঃ এর 'গারস' নামক কূপের পানি দিয়ে গোসল দেওয়া হয়। রাসুল সাঃ এই কূপের পানি পান করতেন। গোসলের পর তিনটি সাদা চাদর দিয়ে রাসুলের কাফনের ব্যবস্থা করা হয়। এসবের মধ্যে জামা কিংবা পাগড়ি ছিল না। রাসুলের অন্তিম শয্যার স্থান সম্পর্কে সাহাবীগণের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল। কেউ চাচ্ছিলেন তাঁকে মিম্বারের কাছে দাফন করতে, কেউ চাচ্ছিলেন বাক্বী কবরস্থানে দাফন করতে আবার কেউ চাচ্ছিলেন তাঁর সালাতের স্থানে দাফন করতে। তখন আবুবকর রাঃ বললেন, "আমি রাসূল সাঃ কে বলতে শুনেছি, এমন কোনো নবীকে পৃথিবী থেকে উঠানো হয়নি যাকে সেই স্থানে দাফন করা হয়নি যেখানে তার মৃত্যু হয়েছে"। এরপর

আবু তালহা রাঃ রাসূলের বিছানা উঠিয়ে নিলেন। যেখানে তাঁর মৃত্যু হয়েছে সেই বিছানার নিচে কবর খনন করা হলো।

সাহাবীগণ পালাক্রমে দশজন দশজন করে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে জানাযার সালাত আদায় করলেন। নির্ধারিত কোনো ইমামের ব্যবস্থা ছিলনা। সর্বপ্রথম রাসুলের পরিবারের লোকেরা জানাযার সালাত আদায় করল। এরপর ক্রমান্বয়ে মুহাজির, এরপর আনসারগণ জানাযার সালাত আদায় করলেন। এরপর ক্রমান্বয়ে অন্য পুরুষ, মহিলা, শিশু ও দাসগণ জানাযার সালাত আদায় করলেন। মঙ্গলবার দিন পুরোটাই অতিবাহিত হয়ে যায় জানাযার সালাত আদায়ে। মঙ্গলবার দিন অতিবাহিত হওয়ার পর বুধবার রাতের মধ্যভাগে রাসূল সাঃ এর দেহ মোবারক কবরস্থ করা হয়। রাসূল সাঃ এর দাফনের সময় ফাতিমা রাঃ আবেগাপ্লুত হয়ে আরও বলেন, "হে মানুষেরা! তোমাদের আত্মা কীভাবে স্থির আছে যখন তোমরা আল্লাহর রাসূলের উপর মাটি দিয়ে ঢেকে দিচ্ছ"? (সহীহ বুখারি)

কনোস ইবনে মালিক রাঃ বলেন, “আমরা আল্লাহর রাসূল সাঃ কে দাফন করতে নিজেরা স্বশরীরে অংশ নিয়েছিলাম। রাসূল সাঃ কে দাফন করে আমরা তখনও হাত মুছিনি কিন্তু আমরা আমাদের অন্তরে পরিবর্তন অনুভব করছিলাম”।

সহায়ক পুস্তক

সিরাতুন নবী - ড. আলী মোহাম্মদ সাল্লাবি।

আর রাহীকুল মাখতুম -আল্লামা শফিউর রহমান মোবারকপুরী

সীরাহ:- রেইন্ড্রপ্স মিডিয়া

খাতামুল আম্বিয়া :- মুফতী মুহাম্মদ শফি রহ:

আই ও এম কর্তৃক পাঠ্য রিসোর্স সমুহ